দাম : দশ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে
বিধানসভা নির্বাচন
ও মুসলমান তোষণ
— পৃঃ ১১

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার
অন্তর্জলি যাত্রায়
দুই সরকারের
ভূমিকা
— পৃ : ২৪

৬৮ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ২৮ মার্চ ২০১৬।। ১৪ চৈত্র - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৭।। website : www.eswastika.com ।।

আপনার হাতে এরাজ্যের ভবিষ্যৎ

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন - ২০১৬

- ৪ এপ্রিল, ২০১৬
- ১১ এপ্রিল, ২০১৬
- ১৭ এপ্রিল, ২০১৬
- ২১ এপ্রিল, ২০১৬
- ২৫ এপ্রিল, ২০১৬
- ৩০ এপ্রিল, ২০১৬
- ৫ মে, ২০১৬

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ১৪ চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৮ মার্চ - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

বাম-কং জোট : নীচুতলার ইচ্ছা না ওপর তলার ধান্দা ? ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ৬

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৭-৮

কোথায় সারদা আর কোথায় নারদ একদম মানায় না ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

তৃণমূলের ঘুষকাণ্ডের প্রতিবাদ ইভিএমে দেখা যাবে কি ? ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ও মুসলমান তোষণ ▯ বিমল প্রামাণিক ▯ ১১

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ আপনার হাতেই ▯ মোহিত রায় ▯ ১৪

পশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদী তাণ্ডব— সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে ▯ ১৬

মুসলমান তোষণ ও মমতা ব্যানার্জী সমার্থক ▯ ১৮

শিল্প ভাঁওতায় বামেদের পাঁচ গোল মমতার ▯ শিলাদিত্য ঘোষ ▯ ১৯

শিল্পে বাংলার অন্তর্জলি যাত্রা : গত চার দশক, ফিরে দেখা ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ২২

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রায় দুই সরকারের ভূমিকা ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ২৪

সাধারণ রোগবালাইয়েরও সহজলভ্য চিকিৎসা দেওয়া হয়ে উঠছে না ▯ ডা: অভিষেক ব্যানার্জী ▯ ২৭

গত পাঁচ বছরে মমতা সরকারের ব্যর্থতা ▯ ২৯

জালনোট পাচারের সবচেয়ে বড় ট্রানজিট রুট মালদার কালিয়াচক ▯ ৩১

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে মোদী সরকারের সাফল্যকে হাতিয়ার করছে বিজেপি ▯ ৩৩

চিকিৎসা পরিষেবা ও গুণমানযুক্ত শিক্ষা সহজলভ্য হোক : আর এস এস ▯ ৩৬

বাঘের পিঠে পাকিস্তান, নরেন্দ্র মোদীর বাড়ানো হাতই এখন ভরসা ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ৪১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ৩৯-৪০

স্বস্তিকা

বাংলায় শিশুমন্দির

সারা ভারতে শিশুশিক্ষা জগতে শিশুমন্দির আজ এক উল্লেখযোগ্য আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গেও এই আন্দোলনের ভূমিকা কম নয়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে এ এক আশার আলো। এবিষয়েই আলোকপাত করেছেন এই আন্দোলনের কয়েকজন পুরোধাপুরুষ, অভিভাবক ও শিশুমন্দিরের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী।

দাম একই থাকছে ১০ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

তোষণের পরিণতি

গলায় ছুরি ধরিলেও 'ভারতমাতা কী জয়' বলিবেন না বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন অল ইন্ডিয়া মজলিশ ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রধান ওয়াইসি। ইহাই স্বাভাবিক। কারণ মুসলমানের দৃষ্টিতে ভারত তাহাদের কাছে মাতৃভূমি নয়, ভূমিখণ্ড মাত্র। এই দেশকে শাসন শোষণ সন্ত্রাসে ধ্বংস করিবার অধিকার তাহাদের রহিয়াছে, শ্রদ্ধা করিবার নয়। তাই ঝুলি হইতে বিড়াল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হায়দরাবাদের ইসলামিক সেমিনারি জাসিয়া নিজামিয়াতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ভারতমাতা কী জয় স্লোগানের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করিয়া বলা হইয়াছে— 'এই স্লোগান ইসলামে নিষিদ্ধ। ভারতভূমিকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করিবার কোনো যুক্তি নাই।' উল্লেখ্য, বেদে পৃথিবীকে মাতা বলা হইয়াছে। অথর্ববেদের 'ভূমিসূক্তে' বলা হইয়াছে 'মাতাভূমি পুত্রোহহম্ পৃথিব্যাঃ' অর্থাৎ এই ভূমিখণ্ড মাতৃসমা, আমি তাঁর পুত্র। তাই দেশজননীর সুরক্ষায় সুপ্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত কত সহস্র প্রাণ বলিপ্রদত্ত হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। দেশজননীর শৃঙ্খল মোচন করিতে স্বাধীনোত্তরকালে কত সহস্র সন্তান ফাঁসির মঞ্চে ভারতমাতার বন্দনা করিয়াছেন তাহারও হিসাব নাই। আজও শত্রুর হাত হইতে দেশজননীকে রক্ষা করিতে জীবন বাজি রাখিয়া অতন্দ্র প্রহরী হইয়া কাজ করিতেছে কত সহস্র সৈনিক। এই দেশের মানুষের নিকট জন্মভূমি শুধুই দেশজননী নয়, তাঁহার স্থান আরও উপরে— মঙ্গলময়ী পুণ্যভূমি। অথচ এই দেশের জল হাওয়ায় প্রতিপালিত কিছু নেমকহারাম মানুষ ভারতমাতার জয়ধ্বনি দিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দেশকে জননী বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহারা এই দেশে বসবাস করিতেছেন কোন লজ্জায়? অবিলম্বে এই দেশ হইতে তাহাদের বিদায় করা উচিত। যদিও আজ ধর্মনিরপেক্ষতা ও সহিষ্ণুতার নামে দেশে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চলিতেছে। এক শ্রেণীর মানুষ দেশকে কলঙ্কিত করিবার প্রচেষ্টায় নিয়তই উদ্যত। আমাদের উদারতা এবং সহিষ্ণুতাই আজ আমাদের বিষাদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সুব্রহ্মণ্যম স্বামী এই প্রসঙ্গে এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুত্ব লইয়া যাঁহাদের এত অসূয়া, তাহাদের মনে রাখা উচিত—ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে বৃটিশ বা তথাকথিত কিছু মুসলমান দরদি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ঘোষণা করেন নাই। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হইয়াছে হিন্দুদের ইচ্ছাতেই। বৃটিশরা তাহা চাহে নাই। তাহারা চাহিয়াছিল হিন্দু ভারত ও মুসলমান পাকিস্তান। দেশের হিন্দুরা না চাহিলে ভারত কখনও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হইতে পারিত না এবং গত ৬০ বছর ধরিয়া ধর্মনিরপেক্ষ দেশ থাকিয়া যাইত না। উল্লেখ্য, পাকিস্তান কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নহে এবং সেই দেশে বসিয়া দেশকে অসম্মান করিলে কী পরিণতি হয় তাহা সকলেই অবগত। অথচ বাক্-স্বাধীনতার নামে এই দেশে দেশবিরোধী নানা মন্তব্য চলিতেছে এবং তাহাকে সমর্থন করিবার লোকেরও অভাব নাই। দেশের কিছু নেতা ও ছাত্র আজ বাক্-স্বাধীনতার দোহাই দিয়া দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে—যা ভবিষ্যতের জন্য এক অশুভ ইঙ্গিত। বর্তমানে আমরা দেখিতেছি পাকিস্তানের নামে জয়ধ্বনি, ভারতের নিন্দামন্দ এমনকী দেশের বিচারের রায় লইয়াও প্রশ্ন তোলা হইতেছে। দেশপ্রেম বস্তুটি কমিউনিস্টদের কোনওকালেই ছিল না। বৃটিশ আমলে ইহারা দেশদ্রোহীর ভূমিকা পালন করিয়াছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের বেদীমূলে উৎসর্গিত দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রকেও কুৎসা করিয়াছিল কমিউনিস্টরা। কাজেই কানহাইয়ার মতন অর্বাচীন দেশদ্রোহী ছাত্রনেতাদের কমিউনিস্টরা সমর্থন করিবে ইহাই স্বাভাবিক। ইশরত জাহানের মৃত্যু প্রসঙ্গে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়িয়া গিয়াছে। আর এই সব দেশদ্রোহী কাজকর্ম দেখিয়া কিছু মানুষ যদি উত্তেজিত ও অধৈর্য হইয়া তাহাদের প্রতি বিরূপ আচরণ করিয়া থাকে তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইবে কি?

সুভাষিতম্

অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাঘ্রং নৈব চ নৈব চ।
অজাপুত্রো বলিং দদ্যাৎ দেবোদুর্বলঘাতকঃ।।

যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য ঘোড়া নয়, হাতি নয়; বাঘের তো প্রশ্নই নেই। শুধুমাত্র পাঁঠা বলি দেওয়া হয়, কেননা দেবতারাও দুর্বলকে রক্ষা করেন না।

বাম-কং জোট

নীচুতলার ইচ্ছা না ওপর তলার ধান্দা?

অভিমন্যু গুহ

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের এক ছাতার তলায় আসাকে উভয় দলই 'নীচুতলার ইচ্ছা' বলে চালানোর চেষ্টা করছে। তাদের বক্তব্য তৃণমূলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাম-কংগ্রেস কর্মীরা এককাট্টা হয়েছেন। সুতরাং তাঁদের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতেই বাম-কংগ্রেস নেতারা সমঝোতা বা জোট কিছু একটা পথে (কোন পথ সেটা তাঁরা নিজেরাই জানেন না) এগিয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হলো এসব ছেঁদো যুক্তি উভয় দলের তলানিতে ঠেকা কিছু কর্মী বিশ্বাস করতে পারেন, সাধারণ মানুষ করছেন না। এ ধরনের নির্বাচনী সমঝোতা আগে সেভাবে হয়নি বটে, অন্তত প্রকাশ্যে কিন্তু নির্বাচনোত্তর সংসদীয় সমঝোতার নমুনা বাংলার মানুষ আগেও বহুবার দেখেছেন। সত্যি কথা বলতে কী এই জোটে যদি কোথাও নীচুতলার ইচ্ছা

থেকে থাকে তবে সেটা অবশ্যই বামফ্রন্টের, আরও ভালোভাবে বললে সিপিএমের। কারণ রাজ্যে পালাবদলের পর সিপিএম কর্মীদের একটা বড়ো অংশ জার্সি পরিবর্তন করেছেন। বাকিরা এখনও যাঁরা পড়ে রয়েছেন তাঁরা যত না আদর্শের কারণে, তার চেয়ে বেশি কোথাও ঠাঁই পাননি বলে। এদের সম্পর্কে চৌত্রিশ বছর ধরে যাঁরা বিরোধী থেকেছেন (যাঁদের মধ্যে বহু কংগ্রেস কর্মীই রয়েছেন) তাঁদের এক ধরনের ঘৃণাবোধ কাজ করে। কারণ তৃণমূল অত্যাচারী কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু বিগত দিনে সিপিএম বাংলার মানুষ তথা বিরোধীদের ওপর যে অত্যাচার করেছে, তৃণমূলী অত্যাচার তার তুলনায় নগণ্য।

বিরোধীদের ওপর সিপিএমের অত্যাচারের দীর্ঘ খতিয়ান দেওয়ার দরকার নেই। কলকাতা-সহ রাজ্যের সর্বত্র কংগ্রেস-কর্মীদের ওপর সিপিএমের অত্যাচার নিয়ে ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন পড়েছে। স্বস্তিকায় এনিয়ে লেখালেখিও হয়েছে। সুতরাং কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা এই জোট চাইছেন তা মনে করার কোনো বিশ্বাসযোগ্য কারণ আছে কি? সবচেয়ে মজার কথা, এই জোটে যে সিপিএমের পোয়াবারো সেটা কংগ্রেস কর্মীরাও জানেন। জনসমর্থন তাদের তলানিতে, কংগ্রেসী খড়-কুটোকে ধরে যেটুকু ভেসে থাকা যায়। সিপিএম নেতারা খুব ভালো করেই জানেন, কংগ্রেসের ভোটটুকু না জুটলে এবার বিরোধী দলের সম্মানটুকু (অন্তত ৩০টি আসন পেতেই হবে) রক্ষা করাই অসুবিধের। কিন্তু প্রশ্ন এতেও কি শেষ রক্ষা হবে? কংগ্রেসের কমিটেড যাঁরা ভোটার, তাঁরা কি সিপিএমকে ভোট দিতে পারবেন?

কোনো সন্দেহ নেই মালদা-মুর্শিদাবাদ বাদে কংগ্রেসের কোথাও সাংগঠনিক অস্তিত্ব সেভাবে নেই। জনসমর্থনও তলানিতে। যেটুকু রয়েছে সেটা তাদের 'কমিটেড' ভোট, যেটা স্বাধীনতার আগে থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছে। এবং কিছু প্রজন্ম এখনও সেই ধারা বজায় রেখেছেন। কিন্তু সেটা কত শতাংশ? একটা বিধানসভা কেন্দ্রে ন্যূনতম প্রভাব ফেলার ক্ষমতা কি তার রয়েছে? কংগ্রেসের এই মুহূর্তে মালদা- মুর্শিদাবাদ বাদে গোটা পশ্চিমবঙ্গে যা হাল তাতে আক্ষরিক অর্থেই তাদের কর্মীর থেকে নেতাদের সংখ্যা বেশি। এই নেতাদের অধিকাংশই তৃণমূল থেকে বিতাড়িত বা তৃণমূলে কক্ষে পায়নি। অথচ বিধায়ক হওয়ার সাধ রয়েছে এদের ষোলো আনা। সুতরাং জোটটা হলে যদি এ যাত্রায় বিধায়ক হওয়ার সাধ মেটে। এটাই জোটের পক্ষে কংগ্রেসের একমাত্র 'মোটিভেশন' এবং বলাই বাহুল্য এতে 'নীচুতলা' (যার অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন)-র চেয়ে 'ওপরতলা'-ই অনেক বেশি আগ্রহী, নিজেদের ধান্দার কারণেই।

যে জন্য গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের একগাদা নেতা-নেত্রী যখন জমানত জব্দের ভয়ে এতে অংশগ্রহণ

করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তখন এবারে ভোটে দাঁড়াতে তাঁদের এত উৎসাহ কেন? উত্তর একটাই— বিধায়ক হওয়ার মোহ। একথা অনস্বীকার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থানের পেছনে কংগ্রেসের এই জাতীয় লোকদের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মতো নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে হালে পানি পাননি। সেখানে মমতার এই অভূতপূর্ব সাফল্য এল কী করে? বিশেষ করে দল-বহির্ভূতভাবে ব্যক্তিগত ক্যারিশ্মার নিরিখে লড়াইয়ে সাফল্য পশ্চিমবঙ্গে যখন মমতার আগে ছিল না। উত্তর একটাই। সাতাত্তরে ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যবস্থা কুক্ষিগত করার পাশাপাশি বিরোধী দলের কিছু নেতাকেও হাত করে (এদেরকে বলা হোত তরমুজ, অর্থাৎ ভেতরে লাল, বাইরে সবুজ। এদের অনেকেই এখন যদিও তৃণমূলে)। তাই সিপিএমের বিরুদ্ধে মমতার লড়াই বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করেছিল বলেই তিনি সাফল্য পেয়েছেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা তখন থেকেই তলানিতে। ২০০৪-এ সংসদীয় সমঝোতা এই অশুভ আঁতাতেরই প্রতিফলন ছিল। তাই ২০১৬-য় এই নির্বাচনী সমঝোতা অভূতপূর্ব হতে পারে কিন্তু আশ্চর্যের নয়। শুধু অবাক হওয়ার বিষয় বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর এব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া। বর্তমানে কংগ্রেসের দৈত্যকুলে তিনি একমাত্র প্রহ্লাদ যাঁর সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তিনিও বাস্তবটা অনুধাবন করতে পারছেন। প্রথমত, তিনি তো আর কংগ্রেসের শুধু মুর্শিদাবাদ জেলার সভাপতি নন, গোটা পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি। তাই পার্টির অস্তিত্ব টেকাতে তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতাদেরও সিপিএমের সমর্থনে জেতাতে একটা মরিয়া চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, মুর্শিদাবাদ জেলাতেও একমাত্র বহরমপুর লোকসভা আসনটি বাদে বাকি দু'টি অর্থাৎ জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা আসনেও যে কংগ্রেস দুর্বল হয়েছে গত নির্বাচনেই তা টের পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদে সিপিএম তো জিতে গিয়েছিল। আর জঙ্গিপুরে প্রণব-পুত্র অভিজিত কোনোক্রমে জিতেছিলেন। তাই একদা চরম শত্রু সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুর্শিদাবাদ রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত অধীর। এবং তাঁর যা 'রাজনৈতিক চরিত্র' (২০০১-য়ে তৃণমূলের সঙ্গে জোটের ক্ষেত্রেও যেটা দেখা গিয়েছিল) তাতে গোটা মুর্শিদাবাদে একাধিপত্য কায়েম করাই তার লক্ষ্য। আর এতে সিপিএম নেপোয় দই মারার চেষ্টা করলে 'বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই'য়ে যেতে তিনি কোনো দ্বিধা করবেন না। মনে রাখা দরকার, গত পুর-নির্বাচনে অধীর দুর্গ বহরমপুরেও তৃণমূল ফাটল ধরিয়েছিল। সুতরাং রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা অধীরের রয়েছেই।

সব মিলিয়ে এই বাম-কং জোট যে ধান্দাসর্বস্ব তাতে রাজ্যের মানুষ তো বটেই, এমনকী কংগ্রেস কর্মীরাও নিঃসন্দিহান। ভয় হয়, দেশবিরোধী সিপিএমের পাল্লায় পড়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সাইনবোর্ডটাও না এবার আলিমুদ্দিনের গোডাউনে চলে যায়। জেএনইউ— আফজল গুরু কাণ্ডে রাহুল-সোনিয়ারা যা শুরু করেছেন, তাতে নেহরু, ইন্দিরা, রাজীবের 'আত্মা'রাও চমকে যাবে। এই জোট শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই অশুভ নয়, দেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষেও ভয়াবহ।

সিপিএম-বামফ্রন্টের অত্যাচারের কয়েকটি নমুনা

১৯৭৮ মরিচঝাঁপি

দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুলিশ ও হার্মাদ বাহিনীর আক্রমণে বহু হতাহত। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু।

১৯৭৯ কলকাতা বন্দর— শ্রমিকের উপর গুলি, মৃত্যু ৬।

১৯৮২ বিজনসেতু

১৮ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে কলকাতায় বিজন সেতুতে পুড়িয়ে হত্যা।

১৯৮৬ কৃষ্ণনগর

বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর নির্বিচারে গুলি। নিহত ২।

১৯৯০ বানতলা

মহিলাদের শ্লীলতাহানি ও দুই'জন মহিলাকে হত্যা।

ধানতলায় কন্যাযাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি।

১৯৯৩ কলকাতা

পুলিশের গুলিতে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু।

১৯৯৮-০১ পশ্চিম মেদিনীপুর

কেশপুর, গড়বেতা, পিংলার গ্রামে নারকীয় হত্যা, হামলা। ঘরছাড়া বহু।

২০০১ ছোট আঙারিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর

১১ জন রাজনৈতিক কর্মীকে পুড়িয়ে হত্যা।

২০০৬ সিঙ্গুর, হুগলী

কৃষিরক্ষা কমিটির সমর্থকদের উপর সিপিএম পুলিশের হামলা, তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে হত্যা।

২০০৭ নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর

পুলিশ ও হার্মাদদের যৌথ হামলা, গুলিতে ১৪ জন হত। শতাধিক আহত। ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি।

২০০৮ কোচবিহার জেলার দিনহাটা

পুলিশের গুলিতে ৬ ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী নিহত।

ভারত সরকার উদ্বাস্তুদের ভারতে বসবাসের আইনি স্বীকৃতি দিল

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা চলছে গত ৬০ বছর ধরে। দেশভাগের সময় ড. আম্বেদকর সহ অনেকেই দু'দেশের মধ্যে জন-বিনিময় চেয়েছিলেন। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে তা কার্যকরী হওয়ায় সেখানে ধারাবাহিক উদ্বাস্তু সমস্যা হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা না হওয়ায় সেই নিপীড়ন আজও অব্যাহত। ১৯৫০ সালের নেহরু-লিয়াকত চুক্তির সুযোগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে যাওয়া মুসলমানদের বেশিরভাগ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবার স্বদেশে ফিরে আসেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান উদ্বাস্তুদের আগমন আজও বন্ধ হলো না। অথচ গত ৫০ বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি মুসলমানকেও উদ্বাস্তু হতে হয়নি। এই অন্ধকার সময়ের শেষ করলেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি সরকার। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো একটি ঘোষণায় জানান যে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসাধারণের ভারতে প্রবেশকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হলো। সংখ্যালঘু বলতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন ও পার্সিদের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যাঁরা কোনো উপযুক্ত প্রমাণপত্র ছাড়া প্রবেশ করেছেন বা যাদের প্রমাণপত্রের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে (যেমন ভিসা, পাসপোর্ট), তাদের কারও ক্ষেত্রেই পাসপোর্ট আইন ১৯২০ বা বিদেশি আইন ১৯৪৬-এর ধারাগুলি কার্যকর হবে না। সবাই আইনত এদেশে থাকতে পারবেন।

—বি স কে, কলকাতা

উবাচ

"সীতারাম ইয়েচুরিজী, আপনি আলোচনা করলে তা অভিব্যক্তির স্বাধীনতা আর আমি আলোচনা করলে তা অসহিষ্ণুতা?"

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

আধার বিল নিয়ে সংসদে সিপিএম সাংসদ ইয়েচুরিকে কটাক্ষ।

"এটা ভারতে ঘটেছে। ভারত বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে যে সে বিশাল কিছু করার ক্ষমতা রাখে। আমরা অলিম্পিকের আয়োজনও করতে পারি।"

শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর

দিল্লীতে 'আর্ট অব লিভিং' প্রসঙ্গে।

"কোনো ব্যক্তি, দল কিংবা সরকারের সমালোচনাকে বিজেপি স্বাগত জানায়। কিন্তু দেশের সমালোচনাকে সহ্য করবে না। বাক্-স্বাধীনতার অজুহাতে জাতীয়তা-বিরোধী কাজকর্মকে সমর্থন করা যায় না।"

অমিত শাহ
বিজেপি সভাপতি

"এমন ঘটনা গত চার দশকে কখনও ঘটেনি। ১৯৭৫ সালে ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প চালু হওয়ার আগে জঙ্গিপুর বা বহরমপুরে গঙ্গা হেঁটেই পার হওয়া যেত। ফিডার ক্যানেল দিয়ে জল আসার পর বহমান ভাগীরথীকে দেখতে দেখতে মানুষ অতীতের সেই শীর্ণকায়া গঙ্গার কথা ভুলেই গেছে।"

কল্যাণ রুদ্র,
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণের সভাপতি

গঙ্গার জল শুকিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে।

"বিধানসভার ২৯৪টি আসনে আমিই প্রার্থী। দলের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অর্থ আমাকে ভোট দেওয়া।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

বিধানসভা ভোটের প্রচারে।

কোথায় সারদা আর কোথায় নারদ একদম মানায় না

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ,
নবান্ন, হাওড়া

প্রিয় দিদি, বড় দুঃখ নিয়ে চিঠি লিখছি। আপনার গুণধর ভাইয়েরা মান ইজ্জত সব ডুবিয়ে দিল। আপনি যেখানে একটা ছবি এক কোটি ৭৬ লাখ টাকায় বিক্রি করেন সেখানে কিনা সৌগত রায় মাত্র পাঁচ লাখ টাকা ঘুষ নেন!

এটা তৃণমূল কংগ্রেসের কলঙ্ক। আপনি যতই বলুন এটা সাজানো ঘটনা, আমি জানি যে আপনি ঠিকই জানেন এ সবই সত্যি। আপনার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। কিন্তু দলের মান-ইজ্জত রইল না একেবারে। বেইজ্জত হয়ে গেল। সামান্য সিন্ডিকেট চালানো ফুটো মস্তানরা পাঁচ লাখ টাকায় হাত লাগায় না আর সেখানে তৃণমূলের সাংসদ মন্ত্রীরা!

ভাবা যায়! যে তৃণমূল কংগ্রেস সারদার কয়েক শো কোটি টাকা আত্মসাৎ করে চুপচাপ হজম করে ফেলল তারই নেতারা কিনা লাখে কারবার করল। ছিঃ ছিঃ!

এ বড় আজব কুদরতি! সারদা-কাণ্ডের ছায়া ঢেকে দিয়েছিল তৃণমূলকে। যদিও সেই 'ছায়া' ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে আপনাকে বিশেষ বেকায়দায় ফেলতে পারেনি। 'সততার প্রতীক' তো চিরকাল সততার প্রতীকই থাকে! এবারের 'সততার চিত্রনাট্য' অবশ্য সবেমাত্র 'টাইটেল কার্ড' দিয়ে শুরু। এখনও পর্যন্ত একটি ভিডিও মাত্র মিলেছে। নারদ টিভি বলছে আরও আছে। শনৈ শনৈ প্রকাশ পাবে। কিন্তু প্রথম দফার ভিডিও দেখে দিদি আমি বড্ড কষ্ট পেয়েছি। যেখানে দেখা গিয়েছে, তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ এক আইপিএস অফিসার-সহ মোট ১১ জন নেতা-সাংসদ-মন্ত্রী হাতে করে বান্ডিল-বান্ডিল টাকা নিচ্ছেন!

সত্যি বলতে কী, টাকা দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে এমন কী 'ক্ষতি' থাকতে পারে! বাস্তবিক, রাজনীতির পরিসরে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বৃত্তে রাশি-রাশি টাকা-পয়সার যাওয়া-আসা থাকবে, সেটিই স্বাভাবিক। তার উপরে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলটি যদি সততার চিরকালীন জিম্মাদারি নিয়ে বসে থাকে, তা হলে তো আর কথাই নেই!

সততার প্রতীক কখনও দুর্নীতি ভয়ে কম্পিত হয় না! যেমন হয়নি সারদা কাণ্ডেও। তবে কী না, বাংলা প্রবাদ-প্রবচনগুলি বড় ঠোঁটকাটা আহাম্মক গোছের। বাতাসে তাই ইতিমধ্যেই ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে— যা রটে, তার কিছুটা তো বটে! দু'পাশে জোরে জোরে মাথা নেড়ে যদি-বা এর প্রতিবাদ জানানোও যায়, সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে শোনা যায়— সারদাতেও তো যা রটেছিল, তার বেশ খানিকটা 'বটে ছিল'! কিন্তু অতীত নিয়ে কে বেঁচে থাকতে চায়!

আপনার সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নিরন্তর 'তোলাবাজি' আর 'অর্থলুটে'র অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু আপনি নির্বিকার থেকেছেন। গোটা বিষয়টিকে বিরোধীদের চক্রান্ত বলে অপবাদ দিয়েছেন। আসলে দিদি আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস যেন গীতার ধ্যানযোগ বর্ণনায় অর্জুনকে বলা শ্রীকৃষ্ণের সেই উপদেশে প্রাণিত— 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'! যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হলে মহাদুঃখও কাউকে বিচলিত করতে পারে না। বিরোধী সমালোচকরা বোঝে না যে সেই সম্যক যোগাবস্থায় স্থিত তৃণমূলের ঘটমান রাজনীতি।

কিন্তু খটকা আছেই। নারদের ভিডিওটিতে এক প্রবীণ নেতা-সাংসদ (সৌগত রায়) পাঁচ লক্ষ টাকার বান্ডিল হাতে নিয়ে ওই টাকার প্রচুরত্ব নিয়ে নাকি ঘোর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন! কথা হলো, তৃণমূল রাজনীতিতে 'পাঁচ লক্ষ' টাকা পরিমাণের দিক থেকে তেমন সাংঘাতিক কিছুই নয়, বরং নস্যি মাত্র। এতে বাক্‌রুদ্ধ হওয়ার মতো অবস্থা হওয়ার কথাই নয়। অন্য কোনো রাজ্যে এটা ভাবাই যায় না! এ রাজ্যে এটা ঘটছে দেখে, একটা বিষয়ই মনে ওঠে, রাজনৈতিকভাবে তো বটেই, অর্থনৈতিকভাবেও রাজ্যটি কী দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত!

এখানে শিল্প যেমন বিনিয়োগ আনে না তেমনই ঘুষও বিনিয়োগ আনে না। নেতাদের বড্ড কম টাকাতেই কেনা যায়। আসলে সারদা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে হাত খালি। তাই যা পাওয়া যায় ভেবে নিয়ে ফেলেছে।

সেটা ঠিক আছে। পকেটে টান পড়েছে তখন নীতি মাথায় থাকে না। কিন্তু তা বলে দলের মর্যাদা মাথায় থাকবে না! তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য পদ কেড়ে নেওয়া উচিত। এত কম টাকার ডিল করা কি উচিত! দলের একটা প্রেস্টিজ নেই!

তবু ববিদা মানে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে বলতে শুনলাম, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে নেই কথাটা। বাকিরা কি হ্যাঁ!

— **সুন্দর মৌলিক**

তৃণমূলের ঘুষকাণ্ডের প্রতিবাদ ইভিএমে দেখা যাবে কি?

গোপন ক্যামেরায় দেখাচ্ছে তৃণমূলের বড় বড় রথী মহারথীরা হাত পেতে নোটের বান্ডিল নিচ্ছেন। এতটাই অভ্যস্ত হাতে ঘুষ নিচ্ছেন যে দেখলেই বোঝা যায় তাঁরা এই অসৎ কর্মটি প্রতিদিনই করেন। সত্যি কথা বলতে কী ঠিকাদার প্রমোটারদের চুরির টাকায় তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের দিন গুজরান হয়। তিন দশকের বেশি ক্ষমতায় থাকাকালে সিপিএম দলটিও তাদের নেতাদের ঘুষের টাকা নিতে উৎসাহিত করেছে। দলের নীতি অনুসারে মন্ত্রীদের মাসিক বেতন সরাসরি জমা পড়তো দলীয় তহবিলে। মন্ত্রীরা হাতে বেতনের টাকা পেতেন না। দলের বিধায়কদের ক্ষেত্রেও ওই একই নীতি বহাল ছিল। বলাই ছিল এদিক সেদিক করে করেকর্মে খাও। সিপিএমের মন্ত্রীরা নেতারা বিধায়করা করেকর্মে খেয়ে ভালই দিন কাটিয়েছেন। জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দেখেছি তাঁরা প্রতিদিনই মহাকরণে আসতেন নতুন পাটভাঙা সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে। সপ্তাহের ছয়দিনে ছয়টা। বুদ্ধদেববাবুর আবার দামি ব্র্যান্ডের সিগারেট ছাড়া চলতো না। পার্টির সর্বহারা বিধায়করা নিজ নিজ এলাকায় তিনতলা প্রাসাদ বানিয়ে ছিলেন। আজকে বামপন্থীরা ক্ষমতায় নেই। কিন্তু তাঁরা যা সম্পত্তি বানিয়েছেন তাতে তাঁদের নাতিপুতিরা পর্যন্ত রাজার হালে দিন কাটাবে। তাই তৃণমূলের ঘুষকাণ্ড নিয়ে অন্তত বামপন্থীদের মন্তব্য করার অধিকার নেই। বোফর্স থেকে টুজি কেলেঙ্কারিতে কংগ্রেসের রাঘব বোয়ালরা যেভাবে টাকা লুঠেছেন তারপর কংগ্রেস নেতাদেরও কথা বলার অধিকার নেই।

ঘুষের টাকা বা কালোটাকার বান্ডিলেই রাজনৈতিক দলের প্রচারের খরচ খরচা চলে সেকথা এই রাজ্যের শিশুরাও জানে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে টিভি চ্যানেলে ঘুষকাণ্ড দেখার পর এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের নীরব প্রতিবাদ ইভিএমে দেখা যাবে কি? আনন্দবাজার পত্রিকার সমীক্ষা বলছে ৫৮ শতাংশ ভোটদাতা তৃণমূলের ঘুষকাণ্ডের প্রতিবাদ ইভিএমের মাধ্যমে করবেন। এই সমীক্ষার প্রতিবেদন বাস্তবে মিলে গেলে আমি সত্যিই একজন বাঙালি হিসেবে গর্বিত হব। বাঙালি তার সযত্নলালিত মূল্যবোধ হারায়নি দেখে আনন্দিত হব। অতীতে দিল্লীতে অসংখ্য

গূঢ় পুরুষের কলম

ঘুষকাণ্ডের স্টিং অপারেশন হয়েছে। কিন্তু কোনো বাঙালি রাজনীতিক নোটের বান্ডিল নিচ্ছেন এমন ছবি গোপন ক্যামেরায় ধরা পড়েনি। বাঙালি রাজনীতিকদের এই পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে তৃণমূল দলের ভুঁইফোড় কিছু মন্ত্রী এবং সাংসদ। আদতে তৃণমূল দলটাইতো একটা উচ্ছৃঙ্খল দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া দলের সবাই এলেবেলে। হীরক রাজার দেশের গল্পের হীরক রাজা মমতা। আর সকলেই তাঁর স্তাবক বা ভাঁড়। মমতা রেখেছেন, তাই তাঁরা সভা আলো করে বসে আছেন। কথাটা যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ স্বয়ং মমতাই বলেছেন, 'বিধানসভার ২৯৪টি আসনেই আমি প্রার্থী। দলের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অর্থ আমাকে ভোট দেওয়া।' মমতার নির্দেশে ভোটের প্রচারে প্রার্থীর ছবি ছোট করে দিয়ে মমতার ছবিই বড় করে ছাপা হচ্ছে। এবারে ইভিএমে প্রার্থীর নাম ও প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে প্রার্থীর ছবিও থাকছে। ঘুষকাণ্ডে জড়িয়ে বেকায়দায় পড়া তৃণমূল নেত্রী দাবি করতে পারেননি যে ২৯৪টি আসনেই দলের প্রার্থীর ছবির বদলে তাঁর ছবি দিতে হবে।

নারদ নিউজের স্টিং অপারেশন ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হবে কীনা তা নিয়ে আমার সংশয় আছে। যদি দুর্নীতিকে বাঙালি ঘৃণাই করে তবে সারদা কেলেঙ্কারির প্রতিফলন গত লোকসভার ভোটে পড়তো। কমপক্ষে ১৬ লক্ষ লোককে সারদা ও তৃণমূল নেতারা প্রতারিত করেছে। অথচ লোকসভার ফল উল্টো ছবি তুলে ধরেছে। সারদা কেলেঙ্কারি যত গভীর হয়েছে ততই ভোট বেড়েছে তৃণমূল প্রার্থীদের। দিল্লীতে কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিতের সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে সরকার গড়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এ রাজ্যে তৃণমূলের দুর্নীতির ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরেও সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি সেভাবে লাগাতার গণআন্দোলন করতে ব্যর্থ হয়েছে। একটা আধটা মিটিং মিছিল করে দায় সেরেছে। প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে বাদ প্রতিবাদ মান অভিমানেই বিরোধী দলের নেতারা যতটা ব্যস্ত তার এক শতাংশ সময় তাঁরা খরচ করেননি দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারে। আসলে মনে হয় যে মন্ত্রীরা ঘুষ নিচ্ছেন এটা এখন মানুষের কাছে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। নেতারা ঘুষ খায়। সাধারণ মানুষের মতো মাছ ভাত খায় না। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। তাই মমতা প্রকাশ্যে বলছেন না যে জাল ভিডিও প্রচার করার জন্য নারদ নিউজের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা করছি। কারণ, মমতা জানেন যে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা নোট খায়। নোট খেতে না দিলে দলটাই উঠে যাবে। তাই তৃণমূলের ধরা পড়া মন্ত্রী সাংসদরা বুক বাজিয়ে বলছেন, 'বেশ করেছি ঘুষ খেয়েছি, ঘুষ খাবোইতো।' সবাই জানে যে ভোটে জিতে মন্ত্রী হলে ঘুষের টাকায় মন্ত্রীদের প্রাসাদ ওঠে। তবে ভোট দিয়ে দুর্নীতিকে দেখলে হবে না। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতাকে দুর্নীতির অপরাধে জেলে থাকতে হয়েছিল। পরে জেল থেকে বেরিয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে রেকর্ড ভোটে জেতেন। জয়ললিতা বেশি ভোট পেয়েছেন বলেই কি তিনি সৎ? ভোটে জিতলেই কি মমতা আর তাঁর মন্ত্রীরা সব ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে যাবেন? সততার প্রতিমূর্তির সাদা শাড়িতে ঘুষের কালি মুছে যাবে? ■

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ও মুসলমান তোষণ

বিমল প্রামাণিক

ভারতবর্ষের অন্যতম মূল রাষ্ট্রীয় নীতি ধর্মনিরপেক্ষতার ছত্রছায়ায় উদ্ভব হয়েছে এক নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণজনিত পরিবেশ। যেখানে জাতীয়তাবাদী ও কট্টর বামপন্থীদেরও সহাবস্থান ঘটেছে। অন্যদিকে, উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতায় রাজনীতির এক ধরনের ঘোলাটে বাতাবরণে বাংলাদেশের হিন্দু উদ্বাস্তু এবং মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভারতবর্ষে একই তুলাদণ্ডে মূল্যায়ন করার চেষ্টা অনেকদিন ধরেই চলে আসছে এবং বাংলাদেশকেও ভারতবর্ষের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে চালিয়ে দেওয়ার একটা বিকৃত সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। যেসব রাজনীতিকরা জাতীয় স্বার্থ ভুলে তাৎক্ষণিক দলীয় লাভালাভের হিসেবে ভোটের রাজনীতিকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন, তাঁরা এই হিন্দু ও মুসলমান জনস্রোতকে এক অনন্ত ও অপরিজ্ঞাত অভিবাসনের ধারা বলেই নিশ্চিন্ত থাকছেন, আর দীর্ঘদিন ধরে এই সুযোগে সীমান্তের অসংখ্য ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এদেশে ঢুকে পড়া এমন সব অগণিত মুখ যে, তাদের আসল পরিচয়টা কী তা আর চিহ্নিত করা গেল না। এর মধ্যে কে যে সন্ত্রাসবাদী, কে যে চোরাচালানি আর কেই বা শুধুমাত্র ছা-পোষা সংসারী মানুষ। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পক্ষে সেটা নিরূপণ করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। কেননা তখন তাদের সবাইকে কেবলমাত্র উদ্বাস্তু হিসেবে তকমা এঁটে দেওয়া হয়ে গেছে।

পূর্বতন এবং বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে ধীরে ধীরে নিশ্চিতরূপে গত তিন দশকের অধিককাল জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে যা এতদঞ্চলের সামাজিক সংহতিকে বিনষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। ইতিমধ্যেই এই পরিবর্তন একটা জনআগ্রাসনের রূপ নিয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলে ইসলামভিত্তিক সংস্কৃতির দ্রুত উত্থান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ও জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হিসেবে দেখা দিয়েছে। বর্ধমানের খাগড়াগড় ষড়যন্ত্র ও বিস্ফোরণ, মালদার কালিয়াচক থানা ধ্বংস ও উগ্র মুসলমান মৌলবাদীদের পেশীশক্তির প্রদর্শন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের অদ্ভুত নীরবতা ও আত্মসমর্পণ— এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে নয় কি?

ছয় দশকের জনসংখ্যা চিত্রের ভয়াবহ ছবিটা এখানে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে বিশেষভাবে কয়েকটি জেলার ক্ষেত্রে : *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

উত্তর দিনাজপুর জেলার ক্ষেত্রে ১৯৬১ এবং ২০১১ সালের জনগণনা ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলায় গত চার দশকে সবচেয়ে বেশি হিন্দু উদ্বাস্তু বসতিস্থাপন করলেও মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারেনি।

আমরা কয়েকটি জেলার ব্লক পর্যায়ের জনসংখ্যাচিত্রও এখানে উল্লেখ করছি। এসকল তথ্য থেকে ধারণা পরিষ্কার হবে যে কেন মুসলমান এম এল এ ২০০৬-এ ৪৬ থেকে বেড়ে ২০১১-তে ৫৯ জন হয়েছে। এবং ২০১৬-তে তা যে উল্লেখযোগ্য

সরকারি দলের সংখ্যালঘু ভোট পাওয়ার জন্য যে সকল উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড চোখে পড়ছে— তা তো সকল জমানাকে হার মানিয়েছে। ইমামভাতা; ইমামদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বিশেষ সুবিধাদান, মুয়াজ্জিনদের সুযোগ-সুবিধা; মুসলমান যুবকদের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বিশেষ ব্যাঙ্ক ঋণ; মুসলমান ছাত্রদের ভাতা ও স্কলারশিপ মেধা বিবেচনা না করেই; উর্দু অ্যাকাডেমি, ওবিসি কোটার মাধ্যমে মুসলমানদের সুবিধা প্রদান প্রভৃতি যা পশ্চিমবঙ্গের কোনো সরকারের আমলেই চোখে পড়েনি।

সংখ্যক বৃদ্ধি পাবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর প্রধান কারণ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্লক পর্যায়ে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ব্লকগুলিই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বা ৫০ শতাংশের নীচে মুসলমান জনসংখ্যা অধ্যুষিত অনেকগুলি ব্লক রয়েছে। জেলাগুলির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মালদায় সর্বোচ্চ প্রায় ১৫ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যা গত ৬০ বছরে হ্রাস পেয়েছে এবং প্রায় সমপরিমাণ মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১০ শতাংশ বা তার উপর মুসলমান বৃদ্ধি ঘটেছে। এবং প্রায় সমপরিমাণ বা তার বেশি হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাস ঘটেছে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের ৯টি ব্লকের মধ্যে ৭টি ব্লকেই মুসলমান জনসংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশের বেশি। যেমন, হেমতাবাদ, চোপড়া, গোয়ালপোখর ১ ও ২, ইসলামপুর, ইটাহার, করণদিঘী। এর মধ্যে আবার ইসলামপুর ও গোয়ালপোখর-২, ৭০ শতাংশের উপরে রয়েছে মুসলমান জনসংখ্যা।

মালদা জেলায় ১৫টি ব্লকের ১১টিতেই ৫০ শতাংশের উপরে রয়েছে মুসলমান জনসংখ্যা। এর মধ্যে ৭০ শতাংশের উপরে রয়েছে ৪টি ব্লক। যেমন, রতুয়া-২, চাঁচল-২, হরিশচন্দ্রপুর-২ এবং কালিয়াচক-১।

মুর্শিদাবাদের ২৬টি ব্লকের মধ্যে ২৫টিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসংখ্যা। এর মধ্যে ৯টিতে ৭০ শতাংশের উপরে। নদীয়ায় ১৭টি ব্লকের মধ্যে ৫টিতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। যেমন, তেহট্ট-২, করিমপুর-২, চাপড়া, কালিগঞ্জ এবং নাকাশিপাড়া। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ২২টি ব্লকের মধ্যে ১০টিতেই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর মধ্যে বারাসাত-২, বসিরহাট-২ এবং দেগঙ্গায় জনসংখ্যা ৭০ শতাংশের উপরে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ২৯টির মধ্যে ১০টি ব্লকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রধানত উপরোক্ত ৬টি জেলার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যালঘু মুসলমান ভোট পাওয়ার যে প্রতিযোগিতা প্রতিটি নির্বাচনেই চোখে পড়ে তা চূড়ান্ত মুসলমান তোষণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর বর্তমান সরকারি দলের সংখ্যালঘু ভোট পাওয়ার জন্য যে সকল উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড চোখে পড়ছে— তা তো সকল জমানাকে হার মানিয়েছে। যেমন, ইমামভাতা; ইমামদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বিশেষ সুবিধাদান, মুয়াজ্জিনদের সুযোগ-সুবিধা; মুসলমান

একনজরে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার জনসংখ্যাগত পরিবর্তন

রাজ্য/জেলা	ধর্মীয় জনসংখ্যা	১৯৫১	২০১১	পরিবর্তনের হার
পশ্চিমবঙ্গ	হিন্দু	৭৮.৪৫	৭০.৫৪	–৭.৯১
	মুসলমান	১৯.৮৫	২৭.০০	+৭.১৫
উত্তর দিনাজপুর	হিন্দু	৫৯.৮৭	৪৯.৩১	–১০.৫৬
	মুসলমান	৩৯.৪১	৪৯.৯২	+১০.৫১
মালদা	হিন্দু	৬২.৯২	৪৭.৯৯	–১৪.৯৩
	মুসলমান	৩৬.৯৭	৫১.২৭	+১৪.৩
মুর্শিদাবাদ	হিন্দু	৪৪.৬০	৩৩.২	–১১.৪
	মুসলমান	৫৫.২৪	৬৬.২৪	+১১.০
বীরভূম	হিন্দু	৭২.৬০	৬২.২৮	–১০.৩২
	মুসলমান	২৬.৮৬	৩৭.০৬	+১০.২
বর্ধমান	হিন্দু	৮৩.৭৩	৭৭.৮৫	–৫.৮৮
	মুসলমান	১৫.৬০	২০.৭৩	+৫.১৩
নদীয়া	হিন্দু	৭৭.০৩	৭৩.৪৫	–৪.৮৮
	মুসলমান	২২.৩৬	২৫.৮২	+৪.৪
হাওড়া	হিন্দু	৮৩.৪৫	৭২.৯	–১০.৫৫
	মুসলমান	১৬.২২	২৬.২	+৯.৯৮
কলকাতা	হিন্দু	৮৩.৪১	৭৬.৫	–৬.৯১
	মুসলমান	১২.০	২০.৬	+৮.৬
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	হিন্দু	৭২.৯৬	৬৩.১৬	–৯.৮
	মুসলমান	২৬.০৫	৩৫.৫৭	+৯.৫২
উত্তর ২৪ পরগনা	হিন্দু	৭৭.২৬	৭৩.৪৫	–৩.৮৩
	মুসলমান	২২.৪৩	২৫.৮২	+৩.৩৯

যুবকদের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বিশেষ ব্যাঙ্ক ঋণ; মুসলমান ছাত্রদের ভাতা ও স্কলারশিপ মেধা বিবেচনা না করেই; উর্দু অ্যাকাডেমি, ওবিসি কোটার মাধ্যমে মুসলমানদের সুবিধা প্রদান প্রভৃতি যা পশ্চিমবঙ্গের কোনো সরকারের আমলেই চোখে পড়েনি।

প্রশ্ন হলো, এটা করতে হচ্ছে কেন? রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এমনকী অনেক সচেতন নাগরিকও একটা কথা বলে থাকেন যে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে, ২০১১ সালের জনগণনায় মুসলমান সংখ্যা ২৭ শতাংশ, তাদের কথা তো ভাবতে হবে!

১৯৫১ সালের গণনায় ১৯.৮৫ শতাংশ থাকলেও ২০১১ সালে এসে কোন যাদুমন্ত্র বলে মুসলমান জনসংখ্যা ২৭ শতাংশ হয়ে গেল— তা কেউ তলিয়ে দেখেন না। কীভাবে গত চার দশকে ব্যাপক বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির জনসংখ্যাচরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে— তা কেউ গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করছে বলে মনে হয় না। কী বামফ্রন্ট, কী তৃণমূল বা কংগ্রেস তারা মুসলমান ভোট দখলে এমন নির্লজ্জ তোষামোদে মেতে উঠেছে— আগে কখনও এমন দেখা যায়নি। তথাকথিত নীতিবাগীশ দলগুলির কাছে শুধু নির্বাচনে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষাই একমাত্র বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভারত বা পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় স্বার্থ, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য একেবারেই তুচ্ছ বিষয় মনে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতাদের যেভাবে রাজনীতিতে মাথা গলাতে দেখা যাচ্ছে— তা পাকিস্তান-বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার কথা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, যেখানে গত ছয় দশকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অবাধ রাজনীতির আবহাওয়ায় মৌলবাদী মুসলমানরা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা তো ওই জনসংখ্যায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলেই সম্ভব হচ্ছে।

আমরা (মুসলমানরা) কোনো রাজনৈতিক দলকেই তোয়াক্কা করি না। দরকার হলে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে কলকাতায় ফাইনাল খেলা খেলে দিতে পারি।

—ত্বহা সিদ্দিকি
ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা

ত্বহা সিদ্দিকির এই ঘোষণার সঙ্গে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ এস সোহরাউর্দির কুখ্যাত 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র কোনো মিল নেই তো?

মৌলবাদীদের ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা বোঝা যাবে সাম্প্রতিকালে ফুরফুরা শরীফের স্বনামধন্য পীরজাদা ত্বহা সাহেবের একটি প্রকাশ্য জনসভার বক্তব্য থেকে। সেখানে তিনি এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, তাঁরা (মুসলমানরা) কোনো রাজনৈতিক দলকেই তোয়াক্কা করেন না। সেই সঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'দরকার হলে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে কলকাতায় ফাইনাল খেলা খেলে দিতে পারি।' ভয়াবহ ওই ঘোষণা শুনে অনেকেরই মনে পড়ছে বাংলায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচ. এস. সোহরাউর্দির কুখ্যাত 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র ঘোষণার কথা। দিনটি ছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট। মুসলমান মৌলবাদী সন্ত্রাসী রাজনীতির বড় অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে পাকিস্তান-বাংলাদেশ অতিক্রম করছে। তাদের থেকে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের কিছু শেখার আছে বৈকী! এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে তোষণ করে ভোটের রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের কোনো মঙ্গল হবে না। উত্তরোত্তর মৌলবাদী ও বিভেদপন্থী রাজনীতিই শক্তিশালী হবে। বাঙালি হিন্দুরা কী সত্যিই আত্মঘাতী?

স্বস্তিকার গ্রাহক ও কার্যকর্তাদের প্রতি আবেদন

যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের পুনর্নবীকরণ বাকি আছে (ডাকযোগে অথবা কোনো এজেন্টের মাধ্যমে যাচ্ছে) অনুগ্রহ করে তাঁরা আগামী ৫ই এপ্রিলের মধ্যে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করুন, যাতে আগামীতেও আপনার পত্রিকা নিয়মিত পাঠানো সম্ভব হয়।

যে সকল এজেন্টের দু-মাসের বেশি বিলের টাকা বাকি আছে তাঁদের সত্বর টাকা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে আগামীতে বকেয়া টাকার কারণে স্বস্তিকা সরবরাহ বিঘ্নিত না হয়।

—কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ আপনার হাতেই

মোহিত রায়

এপ্রিলে শুরু হয়ে মে-র প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিধানসভা নির্বাচন চলবে পশ্চিমবঙ্গে। পাঁচ বছর পর গণতান্ত্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যবিধাতা ঠিক হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য কি খুব একটা বদলাবে? নাকি বরং যে অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা শুরু করেছে, সেই যাত্রাই চলবে, অন্ধকারে অস্তিত্ব বিলীন না হওয়া পর্যন্ত।

আগের তিন দশকে যখন বারবার সিপিআই এমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট জিততে থাকতো, তখন মনে হয়েছিল এর বোধহয় আর শেষ নেই। বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের শুরু গত শতাব্দীর তিনের দশক থেকে। এক সাম্যবাদী দুনিয়ার লক্ষ্যে আদর্শবাদী বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত এই আন্দোলনকে পুষ্ট করেছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেকগুলি ধারা ছিল, কখনো কখনো এক একটি ধারা হিংসাত্মক পথ অনুসরণ করেছে। কিন্তু মূল ধারা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় গণতন্ত্রের মধ্যেই থেকে গিয়েছে। এই গণতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনীতিতে ক্ষমতায় এসে কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক-কৃষকের দল হয়ে থাকা সম্ভব কিনা সেটাই ছিল অগ্নিপরীক্ষা। ১৯৭৭-এ যখন বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসছে তখন কমিউনিস্ট দুনিয়ার দিন শেষ হয়ে আসছিল। ১৯৮০-র পর কমিউনিজমের প্রথম সফল পরীক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ছত্রখান, কমিউনিজম উধাও তার জন্মস্থান থেকেই। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ভেঙে পড়লো। তারপর চীন নিল এক চমৎকার ধনবাদী পথ, যাতে পরে যোগ দিল ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়ারাও। একমাত্র পড়ে রইলো পরিবারতান্ত্রিক কমুনিজমের দরিদ্র উত্তর কোরিয়া। এরকম একটা আদর্শগত শূন্যতায় পশ্চিবঙ্গের কমুনিস্টরা মুখে কমিউনিস্ট আদর্শবাদের বকবকানি চালু রেখে কেবল দলের অনুগত দাসেদের দিয়ে রাজ্য চালিয়ে, কেবলমাত্র ভোটের জন্য সুবিধাবাদ চালু রেখে রাজ্যটাকে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক দেউলিয়া করে ছাড়লো। তার সঙ্গে রইলো সমাজের সর্বস্তরে চোখ রাঙানোর জন্য একদল ঠ্যাঙারে তৈরি করা যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রান্নাঘর সব জায়গাতেই নজর রাখতো।

চোখ রাঙানো মাস্তানি করা লোককে সবাই একটু সমঝেই চলে। ভারতে ইসলামি শাসন ছিল মুসলমানের অস্ত্রের জোরের শাসন। বৃটিশ রাজত্ব এলেও ইসলামের দাদাগিরিটি কখনো কমেনি। এটি এই ধর্মের মধ্যেই নিহিত। ফলে মাত্র বড় জোর পাঁচ শতাংশ মুসলমানরা ফিলিপাইনস, তাইল্যান্ড (শ্যামদেশ), মায়ানমারে (ব্রহ্মদেশ) যথেষ্ট গণ্ডগোল পাকিয়ে রেখেছে। ফলে মুসলমানদের তোয়াজ করাই একটা রীতিতে দাঁড়িয়েছে অনেকের কাছে। ভারতে এটাকে রাজনীতিতে পাকাপাকি করলেন মোহনদাস গান্ধী, খিলাফত আন্দোলনের মতো একটি ইসলামি মৌলবাদী ও ভারতবিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসকে যুক্ত করে। এরপর ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন যার শুরুতেই যুক্ত ছিল কিছু মৌলবাদী মুসলমান, তারা ইসলামি মৌলবাদীদের সমর্থনকে একটি তাত্ত্বিক স্তরে নিয়ে যায়। এরা মোপলা গণহত্যাকে বিপ্লবী আন্দোলন বানায়, বাংলায় মৌলবাদী তিতুমিরকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বানায়। বারাসতে এখন বাস টার্মিনাস তিতুমিরের নামে।

সংখ্যাগুরু হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে ১৯৪৭ সালে তৈরি হলো পশ্চিমবঙ্গ। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির মাধ্যমে এই হিন্দুপ্রধান অঞ্চলটি ধ্বংস শুরু করলো কংগ্রেস, তারপর তাতে হাত লাগালো কমিউনিস্টরা। ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসার পর ইসলামি মৌলবাদ তোষণের বাঁধভাঙা জোয়ার ডাকলো। মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য মন্ত্রীপদ তৈরি হলো, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা এসে পাল্টে দিল পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনমানচিত্র। ৩৪ বছর ধরে ধীরে ধীরে তৈরি হলো ইসলামি মৌলবাদের জমি। যার দাপট দেখা দিতে থাকল ২০০০ সালের পর থেকেই। মালদায় মেয়েদের ফুটবল খেলা বাতিল হলো, তসমিলা নাসরিনকে তাড়ানো হলো, তিনদিন ধরে দেগঙ্গায় হিন্দু দোকানপাট, মন্দির ভাঙচুর হলো, আরো অনেক কিছু।

তবুও গত বিধানসভা নির্বাচনে এসব কোনো ইস্যু ছিল না, এমনকী বিজেপিও তেমন কিছু বলেনি। অবশ্য তখনো

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর বর্ধমান জেলার খাগড়াগড়ে তৃণমূল নেতা হাসান চৌধুরীর বাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ২ জনের মৃত্যু ও একজন গুরুতর আহত হয়। প্রশ্ন উঠেছে তৃণমূল নেতার বাড়ি এবং একদা তৃণমূলের নির্বাচনী কার্যালয়ে এমন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের আতুড়ঘর করে তোলার পেছনে তৃণমূল নেতাদের হাত নেই তো?

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে বিজেপির প্রায় কোনো ভূমিকাই ছিল না। বামপন্থীদের অপশাসনে বিরক্ত মানুষ নির্বাচনে জয়ী করল তৃণমূল কংগ্রেসকে। বামফ্রন্ট শাসনকে সরানোর সরাসরি ধাক্কাটা কিন্তু দিয়েছিল মুসলমান শক্তিই। মনে রাখতে হবে, ২০০৬-এর নির্বাচনে বামফ্রন্ট ভূমিধস ভোটে জিতেছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব ছিল নগণ্য। এরপর সিঙ্গুর নিয়ে আন্দোলন করে, বিতর্কিত অনশন করেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু করে উঠতে পারেননি। এইসময় ঘটল নন্দীগ্রাম উত্থান। মেদিনীপুরে ইসলামি শক্তি বেশ কিছুদিন থেকেই শক্তিশালী হচ্ছিল। ২০০৬ সালেই তারা মেদিনীপুরে তসলিমা নাসরিনকে কবিতা পাঠ করতে আসতে দেয়নি। সিঙ্গুর যখন নিভুনিভু তখন সিদ্দিকুল্লা সাহেবের জামাতের মুজাহিদরা পুলিশের গাড়ি পোড়াল, পুলিশ অফিসার খুন হলো, রাস্তা কাটা হতে থাকলো, হলো কিছু গুলির লড়াই। সিঙ্গুরে কোনো সহিংসতা হয়নি কিন্তু নন্দীগ্রামের এই জামাত সহিংসতা তৃণমূল-শূন্য নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেরার পথ তৈরি করলো, আর মমতাকে থামতে হয়নি। ২০১১-র নির্বাচনে বিপুল সংখ্যায় জিতে ইসলামি শক্তির এই ঋণ সুদে আসলে মেটাতে শুরু করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইমাম ভাতা, হজ হাউস, দশ হাজার মাদ্রাসার আশ্বাস, সন্ত্রাসী সিমির লোককে সাংসদ বানানো এবং সবশেষে খাগড়াগড়ে জঙ্গি অস্ত্র কারখানা এবং কালিয়াচকে জেহাদি উত্থান। পাশাপাশি চললো হিন্দু জনপদ আক্রমণ, হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, হত্যা। এই সব হয়ে আমরা পৌঁছলাম ২০১৬-র নির্বাচনে।

২০১৬-আরো অন্ধকারের পথে যাত্রা?

২০১৬-র নির্বাচনে বিরোধীরা কী বলছেন? বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস জোট হয়েছে। তাদের প্রধান নির্বাচনী বিষয় হলো দলীয় সন্ত্রাস, অপশাসন ও উন্নয়নে ব্যর্থতা। তৃণমূলের মূল বিষয় হলো তাদের পাঁচ বছরের উন্নয়নের সাফল্য। এখন মানুষ বিচার করবেন কাদের কথা সত্যি বা বেশি সত্যি। বিজেপি কী বলছে? ২০১১-র নির্বাচনে বিজেপি কী বললো তা ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করায় ভারতের রাজনৈতিক পটচিত্রটা অনেকটা পাল্টে যায়। রাজ্যে বিজেপি মাত্র দুটি আসন পেলেও ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, লোকসভা নির্বাচনে ২৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি ছিল প্রথম।

২০১৪-র নির্বাচনে বিজেপি লড়েছিল 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ধ্বনি দিয়ে। কিন্তু তার সঙ্গে ছিল নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা। যে নেতা তোষণের রাজনীতি করেন না, অযথা সংখ্যালঘুর মন রাখতে সংখ্যালঘু প্রার্থী দিয়ে প্রার্থী তালিকা ভরান না।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা তার অস্তিত্বের সমস্যা। গ্রামে শহরে ইসলামি মৌলবাদের আক্রমণ, সরকারে মৌলবাদীদের দাপট— এসব কথা না বলে শুধু উন্নয়ন আর তৃণমূলের চুরির কথা বলে খুব একটা এগোনো যাবে কি?

জনবিন্যাসের পরিবর্তনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ

বিনয়ভূষণ দাশ।। প্রতিটি জনগণনার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারাদেশের ধর্মীয় জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। ধর্মীয় জনবিন্যাসের এই সমস্যাটি সম্যক্‌ভাবে বুঝতে সুবিধে হবে যদি আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার জনবিন্যাসের বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করি।

১৮৯১ সালের জনগণনার ধর্মভিত্তিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। সারণীতে ১৯০১ সাল থেকে জেলার ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা পরিবর্তনের শতকরা হিসেব দেওয়া হল।

উক্ত সারণিতে ১৯২১ এবং ১৯৪১ সালে জেলার ধর্মভিত্তিক কোনো তথ্য না পাওয়ার কারণে দেওয়া গেল না। উপরোক্ত জনবিন্যাস থেকে দেখা যাচ্ছে ১৮৭২ সাল থেকে ১৯০১ সাল অবধি মুর্শিদাবাদ জেলা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১৯০১ সালের জনগণনা থেকে দেখা যাচ্ছে জেলার হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হিসেবের থেকে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা হিসেবে বেড়ে গেছে, মুর্শিদাবাদ জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত হয়েছে। তারপর থেকে প্রতিটি জনগণনায় মুসলিম জনসংখ্যার হার বেড়েই চলেছে ধারাবাহিক ভাবে। পূর্ব-বাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দুদের মতো অবস্থা হয়েছে এ জেলার হিন্দুদের।

একনজরে মুর্শিদাবাদের জনবিন্যাস

জনগণনার সাল	হিন্দু	মুসলমান
১৯০১	৪৯%	৫১%
১৯১১	৪৭%	৫২%
১৯২১	****	****
১৯৩১	৪৪.০৮%	৫৫.২৪%
১৯৪১	****	****
১৯৫১	৪৪.৬০%	৫৫.২৪%
১৯৬১	৪৪.০৮%	৫৫.৮৬%
১৯৭১	৪৩.৪৬%	৫৬.৩৪%
১৯৮১	৪১.১৫%	৫৮.৫৭%
১৯৯১	৩৫.৩৯%	৬১.৪০%
২০০১	৩৫.৯২%	৬৩.৬৭%
২০১১	৩৩.২১% (৩৩.২১)	৬৬.২৭%

পশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদী তাণ্ডব সেই ট্র্যাডিশন আজও চলেছে

পশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদী ইসলামিক তাণ্ডব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতায় আর সরকারি আনুকূল্যে এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস বলা চলে।

মধ্য কলকাতা। ২১ নভেম্বর, ২০০৭।

বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়নের দাবিতে মৌলবাদী দুষ্কৃতীরা মধ্য কলকাতার বুকে দিনভর হাঙ্গামা চালায় যার নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমান তৃণমূল সাংসদ ইদ্রিশ আলি। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তসলিমাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়াতে বিন্দুমাত্র দেরি করেননি।

দৈনিক স্টেটসম্যান। ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সাল।

দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার এক বৃটিশ সাংবাদিক সব ধর্মকেই সমালোচনা করে একটি লেখার পুনঃ প্রকাশ করেন। অন্যধর্মের লোকেরা এতে প্রতিবাদ না জানালেও মুসলমানরা তিন দিন ধরে স্টেটসম্যান অফিসে তাণ্ডবলীলা চালায়। প্রত্যাশিতভাবেই, কোনো কাগজের সম্পাদক, লেখক বা বুদ্ধিজীবীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায়নি।

দেগঙ্গা।

২০১০ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ৬ থেকে ৮ তারিখ— তিনদিন ধরে বর্তমানের তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় মৌলবাদীরা দফায় দফায় তাণ্ডব চালায়। ৩০০টির বেশি বাড়ি ও দোকানে লুঠতরাজ চালায়। ৫০টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকটি মন্দিরে ভাঙচুর হয়। এই ঘটনায় কোনো পুলিশি তৎপরতা তো চোখেই পড়েনি, এমনকী বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন নির্বাক।

কুলপি। ২০১১-র ২৪ অক্টোবর।

স্থানীয় মেলায় পুলিশের হাতে ধরা পড়া ৩ জন মুসলমান দুষ্কৃতীকে ছাড়িয়ে নিতে কয়েক হাজার মুসলমান কুলপি থানা আক্রমণ করে তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। থানার পুলিশ আবাসনের মহিলারাও তাদের হাত থেকে রেহাই পাননি।

ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি। ২০১৩-র ২০ ফেব্রুয়ারি।

এক ইমামের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কলকাতা থেকে গাড়িতে করে গিয়ে মুসলমানরা ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি অঞ্চলে একতরফা লুঠতরাজ ও তাণ্ডব চালায়। ৩০০টি হিন্দু বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এই আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল তৃণমূল সাংসদ ও নিষিদ্ধ মৌলবাদী সংগঠন সিমির নেতা হাসান ইমরানের।

কালিয়াচক। ৩ জানুয়ারি, ১০১৬।

দেগঙ্গা, ক্যানিং, উস্তি, পাঁচলা, জুরানপুর, নলিয়াখালি সমুদ্রগড়,

খোদ কলকাতার রাজপথে গাড়ি পুড়িয়ে দুষ্কৃতি তাণ্ডব।

দেগঙ্গায় মন্দিরে দুষ্কৃতীদের হামলা।

নলিয়াখালিতে লুঠতরাজ ও হিন্দুদের বাড়িতে আগুন।

কালিয়াচক থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের গাড়ি ভস্মীভূত।

ইলামবাজার থানা আক্রমণ ও ভাঙচুর।

উস্তি বাজারে হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর ও লুঠপাট।

বেলডাঙ্গা, ইলামবাজারের সঙ্গে একই সারিতে এখন উচ্চারিত কালিয়াচক। এ বছরের শুরুতেই ইসলামি মৌলবাদী শক্তির পেশীপ্রদর্শনের ঘটনা ঘটে গেল মালদার এই গ্রামে। ঘটনার কেন্দ্রে উত্তরপ্রদেশের এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা। উত্তরপ্রদেশের কমলেশ তেওয়ারীর হজরত মহম্মদকে নিয়ে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ডিসেম্বরের শুরুতেই উত্তরপ্রদেশ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করলেও প্রায় এক মাসের মাথায় পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা একটি গ্রামের মুসলমান গোষ্ঠীর বিক্ষোভ প্রদর্শন যথেষ্ট ভাবার রসদ জোগায়। গত ৩ জানুয়ারি কমলেশ তেওয়ারির ফাঁসির দাবিতে কালিয়াচক যাত্রা আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র লুঠপাট, নথিপত্র ও থানা চত্বরে থাকা যানবাহন জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পেশীশক্তির প্রদর্শনে নিজেদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের সীমা এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে বেঁধে না রেখে তারা হাত বাড়ায় হিন্দুদের প্রতিও। বেছে বেছে হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, বাড়িঘরে লুঠপাট চালানো হয়। ছাড় দেওয়া হয় না মহিলাদেরও। কয়েকজনের সঙ্গে শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটে।

আশ্চর্যের বিষয় কেরোসিন, পেট্রোল, লাঠি, পিস্তল, বোমা-বন্দুক, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে জমায়েতে জড়ো হলেও কাজ হাসিল করেই নিখুঁতভাবে অতি দ্রুততার সঙ্গে সরে পড়ে তারা। উপরন্তু এই ঘটনায় দশজনকে গ্রেপ্তার করে তুলে আনা হলেও তাদের ছাড়িয়ে আনতে পরের দিনই (৪ জানুয়ারি) থানায় হামলা চালায় তারা। স্থানীয়দের বক্তব্য এই জমায়েতে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরাও ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রশাসনের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে কমলেশ তিওয়ারীর ফাঁসির দাবি নিছকই অছিলামাত্র। জালনোটের কারবার, মাদক পাচারে অভিযুক্ত দাগিদের বাঁচাতেই নাকি এই থানা আক্রমণ।

সবথেকে হতবাক করে দেওয়ার বিষয় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা- পুলিশ বাহিনীর উপর এতবড় আঘাত আসা সত্ত্বেও পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে নীরব। এমনকী জাতীয় স্তরের মিডিয়া ছাড়া আঞ্চলিক মিডিয়া কেবলমাত্র উত্তেজনা ছড়ানোর অজুহাতে এই খবরকে সর্বসমন্বয়ে আনতে সাহস দেখায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রিত পুলিশ প্রশাসন যে ফেজ টুপি পরিহিত এই বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে কতটা অসহায় তা এই ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

ইলামবাজার। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

কালিয়াচকের পর বীরভূমের ইলামবাজার। গত কয়েক বছরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা-খুন-জখমের ঘটনায় শিরোনামে এসেছে বীরভূম। সদাইপুর-দুবরাজপুর-জয়দেব থেকে ইলামবাজার— এই এলাকায় গত কয়েক বছরে মুসলমান মৌলবাদীরা সংগঠিত ও সক্রিয় হচ্ছে। কয়েকদিন আগে কাঁকসা থানা এলাকা থেকে এক যুবককে এন আই এ গ্রেপ্তার করে।

বড় কিছু অঘটন ঘটলে তার ফায়দা পেতে পারে বিরোধীরা। তাই শাসক দলের মান বাঁচাতে পুলিশের সক্রিয়তায় জেহাদিদের বড় আক্রমণের হাত থেকে আপাতত বেঁচে গেল হিন্দুরা। ■

মুসলমান তোষণ ও মমতা ব্যানার্জী সমার্থক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান তোষণ ও মমতা ব্যানার্জী বর্তমানে সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার

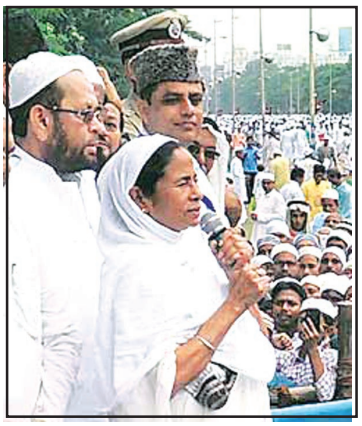

'মাস্কেট'-কে সামনে রেখে, মুসলমান ভোটে ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকতে অনৈতিকভাবে মুসলমান তোষণ তথা পোষণ করতে ব্যস্ত শ্রীমতী ব্যানার্জী ও তাঁর দল। প্রথমেই আসা যাক 'শিক্ষা' প্রসঙ্গে। কারণ যেকোনো সমাজের মান টিকে থাকার অন্যতম শর্ত হলো শিক্ষা।

(১) সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, ৫০

হজ হাউস

শতাংশের কম নম্বর পাওয়া মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার একাদশ থেকে পিএইচডি স্তর পর্যন্ত বছরে ৩২০০ টাকা থেকে ৭০০০ টাকা বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। আর এর জন্য বরাদ্দ বছরে ৫০০ কোটি টাকা।

(২) ২৮ জানুয়ারি মুসলমান ছাত্রীদের জন্য মুসলমান অধ্যুষিত রাজারহাটে গভর্নমেন্ট গার্লস ডিগ্রি কলেজের উদ্বোধন করেছেন।

(৩) ওইদিনই দিলখুশ স্ট্রিটে মুসলমান ছাত্রীদের জন্য ফজলুল হক মুসলমান গার্লস হোস্টেলের উদ্বোধন করেছেন।

(৪) হজ করতে গিয়ে মারা যাওয়ায় তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ।

(৫) রাজারহাটে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে হজ হাউস নির্মাণ।

(৬) কামদুনি কাণ্ডের অপরাধী তৃণমূল কর্মী রফিকুল গাজি ও নুর আলি ছাড়া পেয়েছে।

(৭) পার্ক স্ট্রিট কাণ্ডের দোষীরাও মুসলমান হওয়ায় আইনের নাগালের বাইরে। (৮) তৃণমূল কর্মী সোহরাবপুত্র কর্তৃক বায়ুসেনার কর্মী অভিমন্যু গৌড় নিহত হলেও তৃণমূল তাকে বাঁচাতে তৎপর।

তৃণমূল জমানায় চূড়ান্ত অবহেলিত কৃষিক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের কৃষক আন্দোলনকে হাতিয়ার করে ক্ষমতা দখল করলেও কৃষিক্ষেত্র তৃণমূল জমানায় চূড়ান্ত অবহেলিত। হিমঘরে দলতন্ত্র, তোলাবাজি এবং ফসলের ন্যূনতম কারণে রাজ্যে শুরু হয়েছে প্রতি ক্ষেত্রেই পারিবারিক মুখ্যমন্ত্রী দায় এড়িয়ে দেশে প্রায় ২ লক্ষ কৃষক পশ্চিমবঙ্গে কৃষক

সহায়ক মূল্য না পাওয়ার কৃষকদের মৃত্যু মিছিল। অশান্তির তত্ত্ব আউড়ে চলেছেন। গত ১৫ বছরে আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যার সমস্যা ততটা প্রকট ছিল না। কিন্তু তৃণমূল সরকারের আমলে গত ৮ মাসে ঋণের দায়ে বা ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে ৩৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও ধান উৎপাদনের খরচের মাত্রা দিনের পর দিন বাড়ছে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

শুখা অঞ্চলের সুফলা স্বপ্ন রাজ্যে অধরাই

বিশেষ সংবাদদাতা।। সুযোগ পেয়েও তা নিতে পারল না পশ্চিমবঙ্গ। দেশের যেসব অঞ্চলে সেচের অভাবে চাষের কাজ হয় না, সেখানে ফসল ফলাতে 'নীরাঞ্চল প্রকল্প' চালু করেছে কেন্দ্র। এই প্রকল্পে ৯০ শতাংশ টাকা দেবে কেন্দ্র। ১২ বছরে এই প্রকল্পে ২৯ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার কথা। এই প্রকল্পে পুরুলিয়া বাঁকুড়া-সহ গোটা জঙ্গলমহলের শুষ্ক চরিত্র বদলে যেতে পারত। আশেপাশের জেলাগুলির মাটির উর্বরতা বাড়তে পারত। কিন্তু রাজ্যের অনিচ্ছার কারণে সুখা এলাকায় চাষের স্বপ্ন আপাতত পূরণ হচ্ছে না।

> “যে রাজ্যের মন্ত্রী রতন টাটা সম্বন্ধেও কুৎসিত কথা বলতে দ্বিধা করেন না, সেখানে বিনিয়োগ করবে কোন আহাম্মক শিল্পপতি? তাদের কি প্রেস্টিজ নেই। তারা কি হারহাভাতের দল!”

শিল্প-ভাঁওতায় বামেদের পাঁচ গোল মমতার

শিলাদিত্য ঘোষ

“চার বছরে ৬৮ লক্ষ চাকরি হয়েছে”
জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তার মানে...
দৈনিক ৪৬৫৭.৫৩টি চাকরি।
ঘণ্টায় ১৯৪.০৬টি চাকরি।
আপনার চেনা কজন চাকরি পেয়েছেন?

লেখার শুরুতেই প্রশ্ন মোটেও ভাল জিনিস নয়। কিন্তু রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের মুখে এসে শুধু প্রশ্নই যে মাথায় খেলছে। রাজ্যে প্রচুর শিল্প হয়েছে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। প্রচুর চাকরি হয়েছে বলছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

এখন বড় বড় কথা বললেও রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে এমন ধোঁকাই দিয়ে গিয়েছে বামফ্রন্ট। একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। নতুন শিল্প খোলার চেষ্টাই হয়নি। রাজনীতি করে হলদিয়া, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলকে অচল করা হয়েছে। তবে শেষ দিকে বুদ্ধবাবুকে কেমন একটা শিল্পদরদি হিসেবে খাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সত্যি করেই অকাজের। রেজ্জাক মোল্লার ভাষায়, হেলে ধরার সাহস ছাড়াই কেউটে ধরতে গিয়েছিলেন। এখন একমুখ দাঁড়ি গোফ নিয়ে তত্ত্ব শোনাচ্ছেন। কদিন আগেই সিঙ্গুরে গিয়ে হুঙ্কার শুনিয়ে এলেন। বললেন— বেকারদের নিয়ে ঠাট্টা হচ্ছে!

সিঙ্গুরের সভাপ্রাঙ্গণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বুঝিয়েছেন, কেন এই রাজ্যে শিল্পের এত প্রয়োজন এবং সে কাজে বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এতটাই ব্যর্থ যে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মুড়ি ভাজা, তেলে ভাজার কথা বলছেন। ঠিকই বলেছেন বুদ্ধবাবু। এ রাজ্যে শিল্পের অবস্থা যে ভয়াবহ রকমের করুণ, সে কথা সকলেরই জানা। সিঙ্গুরের সভায় দাঁড়িয়ে তিনি কথাগুলি না বললেও সকলে সে কথা মেনে নিতেন। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দিকে কোনো অর্বাচীন যদি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন— বেকারদের নিয়ে ঠাট্টা হচ্ছে! প্রবীণ সিপিএম নেতার সত্যিই বোধ হয় কিছু বলার থাকবে না। শিল্প নিয়ে তিনি বর্তমান সরকারকে কটাক্ষ করতেই পারেন। কিন্তু তাঁর মনে রাখা উচিত, টাটারা রাজ্য ছেড়ে বিদায় নিয়েছিল তাঁর আমলেই।

সিঙ্গুর-পর্বে বিরোধীদের ভূমিকা মোটেই সদর্থক ছিল না। সিঙ্গুর ঘিরে অবশ্যই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। সিঙ্গুর বামেদের শক্ত জমি নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কেন নাড়িয়েছিল? পরাজিত হওয়ার পরে নন্দীগ্রামের ভুল স্বীকার করেছিলেন বুদ্ধবাবু। সিঙ্গুরের ভুল কবে স্বীকার করবেন! কবে তিনি বলবেন, সিঙ্গুরে টাটাদের ধরে রাখতে পারেননি তিনি! সিঙ্গুরের বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করতে পারেননি তিনি! সিঙ্গুরে

কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। বিরোধীদের বোঝাতে পারেনি তারা। বিরোধীদের প্রতিহতও করতে পারেনি। টাটারা রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার আগে বিরোধী নেত্রীকে কটাক্ষ করেছিল বটে, কিন্তু সে জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 'ক্লিন চিট' পেয়ে যান না। ন্যানো কারখানা চালু করতে না-পারার দায় তাঁকে নিতেই হবে! আশা করা গিয়েছিল, এতদিন পরে সিঙ্গুরে গিয়ে সেই দায় স্বীকার করবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা বেকারদের নিয়ে ঠাট্টা করছেন।

কারখানার সামনে শ্রমিক বিক্ষোভ

সেটা তো তিনিও করছেন। ৩৪ বছর ধরে সে ঠাট্টার সাক্ষী থেকেছেন রাজ্যবাসী। সেজন্যই তিন দশকেরও বেশি সময়ে রাজ্যে শিল্পসম্ভাবনা তৈরি হয়নি। রাজ্যের মানুষ এবং বিরোধীদের শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো যায়নি। সে জন্যই যখন শিল্পের প্রসঙ্গ উঠল, সকলে উল্টো গান গাইলেন। রাজ্য অচল হলো। শিল্পহীন রাজ্যের এটাই ভবিতব্য। প্রবীণ সিপিএম নেতা জানেন, ভবিষ্যতেও রাজ্য ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। তবু রাজনীতি তো করতে হবে! ভোটের লড়াইয়ে টিকে থাকতে হবে! সে জন্যই বেকারের বেকারত্বকে ব্যবহার করতে হয়। এটাও এক ধরনের ঠাট্টাই। বেকারদের নিয়ে ঠাট্টা বড় নিষ্ঠুর ঠাট্টা।

এবার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। বামফ্রন্টের তথা সিপিএমের যোগ্য ছাত্রী। তিনি হয়তো বলবেন, সব কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র। মোদী সরকার চাইলে, কলকাতা রূপে লন্ডন, গুণে সিঙ্গাপুর হোত। মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ওরাকল বাংলাকে দেখতে পায় না। তিরুঅনন্তপুরম বিনিয়োগ পায়, বিজয়ওয়াড়াও পায়, অথচ কলকাতা পায় না। এটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কী? তিনি তো বলেই রেখেছেন, শিল্পের জন্য জমি আছে, চাইলেই মিলিবে। শিল্পপতিরা যেকোনো সমস্যায় তাঁর কাছে যেতে পারেন এবং তিনি সব সমস্যা স্যাটাস্যাট সমাধান করে দেবেন। শিল্পের পরিবেশ? কেন, তিনি শালবনিতে গিয়ে সিন্ডিকেটের দাদা-ভাইদের বকেছেন মনে নেই? শীতকালের হাজার উৎসবের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি শিল্প সম্মেলন করেছেন, নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, খানা-পিনা, ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি যেন না থাকে। আর কী চাই?

ভাবুন তো, যে রাজ্যের মন্ত্রী রতন টাটা সম্বন্ধেও কুৎসিত কথা বলতে দ্বিধা করেন না, সেখানে বিনিয়োগ করবে কোন আহাম্মক শিল্পপতি? তাদের কি প্রেস্টিজ নেই। তারা কি হারহাভাতের দল!

আরও বড় কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই শিল্পের সংজ্ঞা জানেন না। মুড়ি-তেলেভাজা থেকে রবীন্দ্রসংগীত, সবই তাঁর কাছে 'শিল্প'। শিল্প সম্মেলনের নামে একটা উৎসব করলেই সব ফুরিয়ে যায় না। তাতে শিল্প হয় না। কিছু কাজ করতে হয়। শিলান্যাস আর নিজের প্রচার, সরকারি পয়সায় দলের সমাবেশ করলেই কাজ হয় না। মোদী সরকারের শিল্পভাবনাকে কাজে না লাগিয়ে শুধু সমালোচনা করলে কাজ হয় না। তাতে শিল্প টানা যায় না।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সব দোষ কেন্দ্রের। তবে দিল্লীতে নতুন সরকার আসার পরে সব রাজ্য এত শিল্প এলেও বাংলায় আসে না কেন? মুখ্যমন্ত্রী কি নিজেকে প্রশ্ন করবেন? ভোটাররা কিন্তু করবেন। দাদাদের ভয়ে সে প্রশ্ন উচ্চারণ করতে না পারলেও মনে মনে অবশ্যই করছেন এবং করবেন। রাজ্যে কি তবে নতুন কিছুই হয়নি! হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অনেক নামকরণ করেছেন। সম্প্রতি একটি ওয়েবসাইটে সেই নামকরণের মধুর তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। হুবহু তুলে দিলাম। পাঠকরা আর কিছু না পান এত হতাশার মধ্যে একটু আনন্দ পাবেন। ভয়ের পরিবেশেও প্রাণ খুলে হাসতে পারবেন।

নামকে তো আর উপেক্ষা করা যায় না। নামই পরিচয়। নিজের দলের নাম 'তৃণমূল কংগ্রেস' রেখে মাত করে দিয়েছেন তিনি। এর পরেও তিনি থামেননি। ট্রেন অথবা রেল স্টেশন, রাস্তা কিংবা উৎসব, সুযোগ পেলেই নাম দিয়েছেন। আর নামকরণ নিয়ে বারবার আলোচনায় এসেছেন। শুরু করা যাক শেষটি দিয়ে।

১। সত্যজিৎ রায় ধরণী—কলকাতা শহরের লি রোডের নাম দিয়েছেন সত্যজিৎ রায় ধরণী। সরণি নয়। এই প্রথম কোনো রাস্তার নামে এমন বিপ্লব। যদিও পুরসভার নথি থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৮২ সালেই লি রোডের নাম বদলে হয়, 'ও সি গাঙ্গুলি সরণি'!

২। মাটি উৎসব— বাংলায় নানা নামে নানা উৎসব রয়েছে। বাঙালির তো বারো মাসে তেরো উৎসব। কিন্তু একটা 'মাটি উৎসব' বাকি ছিল। সেটাও করে দিয়েছেন। উদ্বোধনের দিন মুখ্যমন্ত্রীর গুণগ্রাহী শিল্পী শুভাপ্রসন্ন বলেছিলেন, ''রবীন্দ্রনাথ যেমন বহু উৎসবের সূচনা করেছিলেন তেমনই মমতার অবদান এই মাটি-উৎসব।''

৩। নবান্ন— ''নবান্ন'' শব্দের অর্থ— 'নতুন অন্ন'। এই নামে বাংলায় একটি উৎসবও আছে। নতুন ধান উঠলে মেতে ওঠে বাঙালি। 'নবান্ন নামে ঐতিহাসিক নাটকও লিখেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য।' মানে 'নবান্ন' পঞ্চাশের মন্বন্তর। কিন্তু এখন, বিষয় রাজ্যের প্রধান সচিবালয়। ২০১৩ সালের

৫ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় হাওড়া শহরে।

৪। উত্তরকন্যা— বাংলা অভিধানে 'উত্তরকন্যা' বলে কোনো শব্দ নেই। তবে বাংলায় আছে। রাজ্যের ছোট সচিবালয়ের নাম। জলপাইগুড়ির ফুলবাড়িতে সচিবালয় শাখা 'উত্তরকন্যা'। ২০১৪ সালের ২১ জানুয়ারি নিজেই নামকরণ ও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। আন্দোলন লোকাল— নামেই বোঝা যাচ্ছে এটি একটি ট্রেনের নাম। ঠিকই ধরেছেন। এক্সপ্রেস নয়, লোকাল ট্রেন। ভারতীয় রেলে লোকাল ট্রেনের এমন নামকরণের রেওয়াজ না থাকলেও 'সিঙ্গুর আন্দোলন'-কে স্মরণীয় করে রাখতে রেলমন্ত্রী থাকার সময়ে এই ট্রেনটির সূচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারাদিন অনেক সিঙ্গুর লোকাল চলে। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে যাওয়া ৩৭৩৯৫ আপ সিঙ্গুর লোকালের শুধু আলাদা নাম রয়েছে।

৬। মহানায়ক উত্তমকুমার— সবাই জানে তিনি বাংলার মহানায়ক। বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বকালের জনপ্রিয় অভিনেতা। কিন্তু এটা তাঁর নাম নয়। এটা টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের নাম। এখানেই শেষ নয়, এর পরের স্টেশনগুলি হলো— নেতাজী, মাস্টারদা সূর্য সেন, গীতাঞ্জলি, কাজি নজরুল, শহিদ ক্ষুদিরাম, কবি সুভাষ। যিনি জানেন না, তিনি এগুলোকে ইতিহাস বইয়ের অধ্যায়ের নাম ভাবতেই পারেন।

৭। বিশ্ব বাংলা সরণি— না, কোনো আন্তর্জাতিক রাস্তা নয়, আমাদের চেনা ই এম বাইপাস। কলকাতা শহরের অন্যতম প্রধান রাস্তা। বিমানবন্দর থেকে রাজারহাট-নিউ টাউন হয়ে গড়িয়া পর্যন্ত বাইপাসের পুরো রাস্তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের ব্র্যান্ডিং 'বিশ্ব বাংলা সরণি' হিসেবে চিহ্নিত। একবার রাস্তাটির একাংশ জ্যোতি বসুর নামে রাখার কথাও হয়েছিল। সেটা বাম আমলে।

৮। মা— টালিগঞ্জের বা চিৎপুরের কোনো সামাজিক পালা নয়, এটি উড়ালপুল। সায়েন্স সিটির কাছেই নতুন উড়ালপুল। ২০১৫ সালের ৯ অক্টোবর পরমা উড়ালপুল উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার নাম রেখেছেন 'মা'।

৯। জয়হিন্দ— স্বাধীনতা সংগ্রামের স্লোগান। এই রাজ্যে অবশ্য এটি একটি জলাধার প্রকল্প। মানে পানীয় জলের প্রকল্প। এক সময়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নামে ওই প্রকল্পের নামকরণও হয়েছিল। তবে এখন বদলে গিয়েছে। উদ্বোধনের দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''কানন (মেয়রের ডাক নাম) আমাকে নামকরণের জন্য বলে। ওকে বলি সামনেই জানুয়ারি মাস, নেতাজীর জন্ম মাস। নাম হোক জয়হিন্দ জলাধার প্রকল্প। এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।''

১০। কথাঞ্জলি— এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাণী সংকল্প। অনেক বলেন 'গীতাঞ্জলি' ও 'কথামৃত' মিলেই এসেছে 'কথাঞ্জলি' নাম। এখানে লেখা কিছু উল্লেখযোগ্য কথামালা— ''উন্নত চরিত্র সভ্যতার সা-রে-গা-মা-পা'', ''যখন সব সেট হয়ে গেছে, তখন আপসেট হয়ো না'', ''এনভায়রনমেন্ট পলিউশন থেকেও মেন্টাল পলিউশন বেশি ক্ষতি করে'', ''নেভার মাইন্ড ফর ব্যাকবাইটিং''।

আরও আরও আছে। হাসতে থাকুন। হাসতে হাসতে ভাবুন কাকে ভোট দেবেন। কী চাই? শিল্প না নামকরণ? চাকরি না উৎসব? ■

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

অম্লানকুসুম ঘোষ

কোনো দেশ বা জাতি বা রাজ্যের বর্তমান অবস্থার বিচার করতে হলে বা নিকট অতীতের সঙ্গে তুলনা করতে হলে যে যে বিষয় নিয়ে তুলনা করা উচিত তা হলো অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ও রাজনীতি। মূলত এই চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করেই কোনো সমাজের সার্বিক অগ্রগতি সূচিত বা ব্যাহত হয়।

এই চারটি বিষয়ের মধ্যে বর্তমানে অর্থনীতি নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সমষ্টি হিসেবে গঠিত হয়। তবু মূলত উৎপাদন পদ্ধতিকে মাথায় রেখে অর্থনীতিকে শিল্প বা শিল্পনির্ভর অর্থনীতি ও কৃষি বা কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিও এই দুই ভাগে বিভক্ত। এবং একদা এই দুটি ভাগই

শিল্পে বাংলার অন্তর্জলি যাত্রা : গত চার দশক, ফিরে দেখা

পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। বর্তমানে দুটি ভাগই যথেষ্ট দুর্বল। এই দুর্বলতার কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। তবে পৃথকীকরণের সুবিধার্থে শুধু শিল্পই বর্তমান আলোচনার কেন্দ্র থাকুক।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প একদা গোটা ভারতের মধ্যে অগ্রণী ছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শিল্পে দেশের এক নম্বর রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের নামই উঠে আসে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। তখন তৈরি সমস্ত শিল্প-সংক্রান্ত আইনে দুটি ভাগ থাকে (এর মধ্যে ব্যাঙ্কিং আইনও পড়ে) এক, কলকাতা ও মুম্বইয়ের জন্য, দুই, অবশিষ্ট ভারতের জন্য। কারণ কলকাতা ও মুম্বই তখন শিল্পপতিদের সবচেয়ে পছন্দের ও শিল্পসংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের সবচেয়ে সেরা জায়গা। স্বাধীনতার আগে তৈরি বৃটিশ শিল্পগুলির অবশিষ্টাংশ, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তৈরি হওয়া স্বদেশি শিল্পগুলি, স্বাধীনতার পরে রাজ্যসরকারের উৎসাহে তৈরি সরকারি-বেসরকারি নানা সংস্থা এবং দেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় তৈরি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ প্রমুখ কিছু কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা সব মিলিয়ে বাংলার শিল্পে তখন জোয়ার।

কিন্তু পূর্ণিমার পরেই আসে অন্ধকার। শিল্পের এই মহান অবস্থার সময়কাল দু' দশকের বেশি কাটল না। সাতের দশক থেকেই শুরু হলো পতন। সাতের দশকের গোড়ায় বাংলা শিল্পে একনম্বর থেকে দু' নম্বরে চলে যায়, সাতের দশকের শেষে পাঁচ নম্বরে। পতনের এই ধারা বজায় রেখে আট নয় ও নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকে দেশের মধ্যে শিল্পে ১৫ নম্বরে নেমে এসেছিল, আর চলমান দশকে তার স্থান বর্তমানে দেশের মধ্যে সবার শেষে।

কিন্তু পতনের এই একমুখী ধারাবাহিকতা কেন? বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে কারণ নানাবিধ এবং তা একের পর এক এসেছে বাংলার ভাগ্যে। চরম দুর্যোগ আসেনি এক দিনে বরং দিনের পর দিন নানান নতুন দিক থেকে সমস্যার কালো মেঘ এসেছে একের পর এক। তাদেরই মিলিত সমন্বয় আজকের এই ঝঞ্ঝামুখর রাত্রি।

সমস্যাগুলিকে ক্রমান্বয়ে পৃথক করে দেখা যাক। প্রথম সমস্যা সাতের দশকের গোড়ায় নকশাল আন্দোলন। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা একদল তরুণ ভ্রান্ত পরিচালনার জন্য হয়েছিল বিপথগামী। তাদের যাবতীয় আদর্শনিষ্ঠা ব্যর্থ হয়েছিল সঠিক দিগ্‌নির্ণয়ে ব্যর্থতা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে। তবে তাদের আন্দোলনের ব্যর্থতা শুধু আন্দোলনকারীদের মধ্যেই নিজেদের প্রভাবকে সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং সমাজব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রকে করেছিল বিধ্বস্ত। শিল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। শিল্পকে নকশাল আন্দোলন আঘাত করেছিল দু'দিক দিয়ে। প্রথমত, এক চরম বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। যা শিল্পপতিদের বিমুখ করেছিল। দ্বিতীয়ত, নকশাল আন্দোলনের মোহে পড়ে অনেক (রাজ্যের মোট জনসংখ্যার নিরিখেও সংখ্যাটা কম নয়) মেধাবী ছাত্র পড়াশোনা ছেড়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে

পরিত্যক্ত সিঙ্গুর।

> “আগের জমানায় শিল্পবন্ধুর মুখোশে মুখ ঢেকে শিল্পের সর্বনাশ করা দেখেছিল জনগণ। আর এ জমানাতে মুখোশ ছিঁড়ে গেছে একটানে, বেরিয়ে পড়েছে মুখ, সেই মুখ প্রকাশ্যেই বলছে, তেলেভাজা শিল্প ছাড়া অন্য কোনো শিল্পের দরকার নেই।”

নেমেছিল। তাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল পরিমাণ মেধাসম্পদ নষ্ট হয়েছিল বাংলার। ফলে যে বিপুল উন্নত মানবসম্পদে সমৃদ্ধ কর্মীবৃন্দের খোঁজে বাংলায় আসত শিল্পপতিকূল তার অভাব ঘটেছিল, ফল পড়েছিল বাংলার শিল্পে।

বাংলার শিল্পের দ্বিতীয় সমস্যা সাতের দশকের মধ্যবর্তী সময়ের দলতন্ত্র। যুক্তফ্রন্ট ও নকশাল পরবর্তী সময়ের সেই কংগ্রেসী (আই) অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম দলতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রও তার কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি।

বাংলার শিল্পের তৃতীয় সমস্যা সাতের দশকের শেষের দিক থেকে শুরু করে ২০০০ খৃষ্টাব্দ অবধি। দলতন্ত্রের যে নির্লজ্জ প্রকাশ এই সময়ের বাংলা প্রত্যক্ষ করেছিল তা ছাপিয়ে গিয়েছিল অন্য যে কোনো সময়ের দলতন্ত্রকে। দলদাস হলে বিনা যোগ্যতায় যে কোনো কারখানার শ্রমিকের কাজ পাওয়া নিশ্চিত। দলদাস হলে সেই শ্রমিকের সারা বছর কাজ না করে ‘আসি যাই মাইনে পাই’ এ ব্যবস্থাও নিশ্চিত। কথায় কথায় ধর্মঘট তো ছিলই। অবশ্য মালিকপক্ষও বঞ্চিত ছিল না। ট্রেড ইউনিয়নের এবং সরকারি ক্ষমতায় থাকা দলের নেতাদের উপযুক্ত পারিতোষিকের দেবার বিনিময়ে পেয়েছিল যখন তখন লকআউট ঘোষণা করতে করতে শেষে কারখানার গণেশ উল্টে দেবার অধিকার। আর ধর্মঘট তো হোত কারখানার ওভার-প্রেডাক্সন ঠেকাতে। আর কোথাও উচ্চ-প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হলে? প্রয়োজনে যারা রাত জেগে প্রযুক্তি-বিরোধিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হোত না সেদিনের ট্রেড-ইউনিয়নের বীরপুঙ্গবরা। দীর্ঘ আড়াই দশকের এই আত্মঘাতী নীতির শেষে আমরা দেখলাম বাংলার শিল্পক্ষেত্র সম্পূর্ণ শ্মশান। সুযোগ-সন্ধানী মালিকপক্ষ ও দলদাস ট্রেড ইউনিয়ন লিডারেরা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, বেশিরভাগ কারখানা বন্ধ হয়ে ভৌতিক অবয়বের মতো দাঁড়িয়ে আছে, বেশ কিছু কারখানার জমিতে উঠছে বহুতল (বন্ধ শিল্পের জমিতে প্রোমোটারি, বাংলায় সেই শুরু)। আর সাধারণ শ্রমিকের দল? মাসে পাঁচশো টাকার সরকারি ভাতার উচ্ছিষ্ট ভোগী।

নতুন সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে অবস্থা বদলের গন্ধ পেয়েছিলেন অনেকে। হাকিম বদলের সঙ্গে সঙ্গে হুকুম বদলেরও আভাস পেয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু হা-হতোস্মি। শেষ অবধি পরিস্থিতির বদল হয়নি। কারণ এই অদ্ভুত দলতন্ত্রে হাকিম একজন হলেও হুকুম চলতো অনেকের এবং সেই হুকুম মেনে চলতে অভ্যস্ত শ্রমিককুল, জনসাধারণ অবস্থা বদলের সাক্ষী হয়নি কেউই। তবু চেষ্টা কিছু হয়েছিল, নতুন শিল্প আনার কিন্তু শিল্পবন্ধুর ভূমিকা নেওয়ার সেই দিনে উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপের অভাবে, সময়োচিত কৌশলের অভাবে এবং বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের অভাবে, সেই শিল্পপ্রচেষ্টা মাঠে মারা গেছিল।

পরিবর্তন আবার এসেছিল। চলমান দশক তার সাক্ষী। কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতোই শিল্পক্ষেত্রও কোনো সুদিন প্রত্যক্ষ করেনি। বরং এক ছদ্ম প্রতিশোধ স্পৃহার আড়ালে (ওরা এতদিন করেছে আমরা করব না কেন?) স্বজনপোষণ চলছেই। শ্মশানরূপী শিল্পাঞ্চলে যে কটি শিল্প মিটমিট করে টিকে আছে, সেগুলিও চলেছে অন্তর্জলি যাত্রার পথে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সিন্ডিকেট (আগের জমানার তোলা আদায়েরই এক অতি সংগঠিত রূপ), ফলে নতুন শিল্পস্থাপনও অসম্ভব প্রায়। আগের জমানায় শিল্পবন্ধুর মুখোশে মুখ ঢেকে শিল্পের সর্বনাশ করা দেখেছিল জনগণ। আর এ জমানাতে মুখোশ ছিঁড়ে গেছে একটানে, বেরিয়ে পড়েছে মুখ, সেই মুখ প্রকাশ্যেই বলছে, তেলেভাজা শিল্প ছাড়া অন্য কোনো শিল্পের দরকার নেই।

এসবেরই ফলশ্রুতি হলো আজকের দিন যখন বাঙালি দেখছে এক উলটপুরাণ ঘটে চলেছে। যে বাঙালি একদা দেখত যে অন্য প্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে কাজ করতে আসছে দলে দলে লোক, আর বাঙালি তাদের ঠাট্টা করছে উড়ে, মেড়ো, খোট্টা বলে, আজ সেই বাঙালিই দেখছে তারা কাজ খুঁজতে যাচ্ছে অন্য প্রদেশে দলে দলে।

তবু বলা চলে পূর্ণিমার পরে যেমন অন্ধকারপক্ষ, অমাবস্যার পরেই সেরকমই শুক্লপক্ষ আসে। ঘনতমসাবৃত রাত্রির পরে আসে রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাত। এই আশা রাখা যায়, হয়তো নতুন কোনো দল সরকারে এসে শিল্পাঞ্চলে আবার ফিরিয়ে আনবে শৃঙ্খলার পরিবেশ। শিল্পক্ষেত্রে বাংলা আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। ■

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রায় দুই সরকারের ভূমিকা

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা ঘেরাও উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়া।

দেবীপ্রসাদ রায়

ছাত্রছাত্রী জানে, অভিভাবকরা হাড়ে হাড়ে জানেন, শিক্ষকরা জানেন, শিক্ষা দপ্তরের পদস্থ কর্মচারীরা জানেন, এমনকী শিক্ষামন্ত্রকও জানে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মৃত্যু ঘটেছে। মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটেছে বামফ্রন্ট আমলে, এখন ভেন্টিলেটরে আছে অন্তর্জলি যাত্রার পথে। যে ব্যাধির সংক্রমণ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার এই হাল, তা শুরু হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক অভীপ্সা পূরণের জন্য, বৃদ্ধি ঘটেছিল সরকারি প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায়, নামি দামি নার্সিংহোমে রোগের এবং রুগীদের যা হয়! সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল নামক সেবা কেন্দ্রে সুচিকিৎসার ঢক্কানিনাদের মাঝে রুগী প্রকৃত চিকিৎসার অভাবে ক্রমশ মনুষ্যসৃষ্ট নিয়তির দিকে চালিত হয়। আজকের রুগী পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা, তারও পরিণতি ওইরকম— কেঁদে মরছে, হা-হুতাশ করছে বঙ্গমাতা (পশ্চিমবঙ্গ)।

ব্যাধির শুরু হয়েছিল স্কুল কলেজে পরীক্ষায় গণটোকাটুকির মধ্য দিয়ে। এর উদ্যোক্তা ছিল আড়ালে সিপিআইএম নেতৃত্ব, দৃশ্যমান ছিল নকশালরা যারা নকশালবাড়িতে জমি দখল ও টাঙ্গি বল্লমের রাজনীতি যুক্তফ্রন্টের প্রশ্রয়েই শুরু করেছিল। কৃষিজমি দখলের জন্য হিংসাশ্রয়ী 'শ্রেণী সংগ্রাম' ও যুগপৎভাবে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণটোকাটুকির মাধ্যমে চরম বিশৃঙ্খলাকে উপনীত করে তুলল উগ্র কমরেড নকশাল। এই বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় দেখেছি অধ্যাপক কমরেড নেতা গণটোকাটুকির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেসী পুঁজিবাদী শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করে সকালে, আবার বিকেলে জনসভায় নকশালদের গণটোকাটুকি আন্দোলনকে সমর্থন করে বক্তৃতা করছেন কংগ্রেস অনুসৃত পুঁজিবাদী শিক্ষাব্যবস্থার এটাই অনিবার্য পরিণতি বলে। অর্থাৎ ঘুরিয়ে সমর্থন করা। হতভম্ব ভদ্র নিরীহ ছাত্রছাত্রীরা বিপথগামীতার শিকার হয়ে পড়ল কমিউনিস্ট নেতাদের প্রযত্নে। তাদের পরিচিত পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিবেশকে সুকৌশলে মার্কসীয় মতাদর্শের বীজ বপনোপযোগী করে দেওয়া হচ্ছিল, গুরুজনদের প্রতি, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যমূলক আচরণকে কু-সংস্কারোচিত বলে চিহ্নিত করা, জাতীয় শ্রদ্ধেয় নেতাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করা এই সব ছিল পদ্ধতি। নতুন কিছুর প্রতি ঔৎসুক্যের জন্য, কমরেডদের কথার কারচুপিতে বিভ্রান্ত ছাত্রছাত্রীরা এই সব অপপ্রচারের শিকার হয়ে পড়ল। গণটোকাটুকি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে চীন আক্রমণজনিত অর্থনীতির উপর চাপ, খাদ্য আন্দোলন, টাকার অবমূল্যায়ন, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কলহ এমনই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল দেশে যে কংগ্রেস- বিরোধী জনমত বেড়েই চলেছিল। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের দৃঢ় পদক্ষেপে নকশাল আন্দোলন এবং গণটোকাটুকি বন্ধ হলেও 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের ক্ষোভ বিকল্প হিসেবে কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) নেতৃত্বে বামফ্রন্টকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন করল এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীদের দুর্ভাগ্যেরও শুরু হল। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে বহুমাত্রিক অপশাসন বা কুশাসনে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, শিক্ষা, শিক্ষানৈতিক জীবনচর্যার মান সমস্ত দিক থেকে তার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে হটে গেল, কৃষক স্বার্থে বর্গা-অপারেশনের নামে নৃশংস বর্গা-অপারেশন কৃষি ক্ষেত্রের শান্তি কেড়ে নিল। বহু নির্ভরযোগ্য নামি কলকারখানা সহ, ছোটখাটো নিয়ে প্রায় ৬৫ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল। শিক্ষায়তনগুলিকে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর অবধি দলীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হলো গায়ের জোরে। ছাত্র ইউনিয়ন দখলের

নাম করে অর্থনৈতিক দুর্নীতিতে ছাত্রসমাজকে যুক্ত করে তার নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়া হলো। ছাত্র-ইউনিয়ন দখলে রাখার জন্য সন্ত্রাস ও হুমকি শিক্ষাপ্রাঙ্গণ ছেড়ে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ীতেও পৌঁছে গেল সবরকম নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে। পাশাপাশি সরকারি নীতির ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একদম বরবাদ হয়ে গেল শিক্ষায়তনে। কীভাবে কলেজে জোর করে বিশ্ববিদ্যালয় বিধি বহির্ভূতভাবে উচ্চ মাধ্যমিক চালু করা হলো প্রথমে নিতান্ত সাময়িক প্রয়োজনে— শিক্ষকরাও বা কলেজ কর্তৃপক্ষ যে সহযোগিতা করেছিল। পরে দেখা গেল সেটি স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে গেল শাসক সিপিআইএম সমর্থক অধ্যাপকদের ও দখল করা ছাত্র-ইউনিয়নের দাপটে ও 'দেখে নেওয়ার' হুমকীতে। অতিরিক্ত শ্রমের জন্য কোনো ভাতার ব্যবস্থা হলো না। কলেজকে কোনো অর্থ সাহায্য করা হলো না। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের (ডিগ্রী) বরাদ্দ ল্যাবরেটরির অর্থ সুড়ঙ্গায়িত হয়ে চলে গলে উচ্চ মাধ্যমিক-এর প্রয়োজনে। শিক্ষকদের এই ব্যাগার দেওয়ার ক্ষতিপূরণ হলো ডিগ্রী ক্লাসকে অবহেলা করে উচ্চ মাধ্যমিকের দায় সারতে। ফলে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ডিগ্রী ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট টিউশনের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠলো, অভাবিতভাবে অর্থ উপার্জনের এক নতুন জানালা খুলে গেল শিক্ষকদের কাছে। পঠন-পাঠন কার্যত বাষ্পীভূত হলো কলেজে এবং সংক্রমিত হলো স্কুলেও। স্কুলে ও কলেজে শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর বিপুল পরিবর্তনেও এবং শেষ অবধি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক চলে গেলেও শুরু হওয়া 'প্রাইভেট টিউশনে'র ব্যবসা বন্ধ তো হলোই না, বরং দাপটের সঙ্গে চলছিল এবং চলছে। এখন এই ব্যবস্থা ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকের কাছে এক স্বাভাবিকতা অর্জন করেছে, স্কুলগুলিতে দেখুন, উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীরা প্র্যাকটিক্যালের দিন যায়, বাকি দিন যায় না। এখন আবার প্রাইভেট ব্যবস্থাপনায় 'প্র্যাকটিক্যাল'-এর ব্যবস্থা হয়েছে অনেক শিক্ষক প্রাইভেট টিউটরের বিনিয়োগে। তাহলে কলেজ স্কুলগুলিতে হবেটা কী? ছাত্র-রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে এগুলি। বিপুল অর্থাগমের সৃষ্ট সম্ভাবনার ছাত্র-ইউনিয়ন দখলের প্রাণান্তকর প্রয়াস চলে— বাইরের রাজনৈতিক গুণ্ডাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে। কলেজগুলিতে এখন ছাত্র ভর্তি হয়, নির্বাচনের নামে ক্ষমতাশীল দলের দখল প্রতিষ্ঠিত হয় যে কোনো মূল্যে, পরীক্ষার প্রহসন হয়— পড়াশোনা হয় না। এর দায়িত্ব অভিভাবকের এবং প্রাইভেট টিউটরদের। মানুষ তৈরি হওয়ার জন্য যে শিক্ষক-ছাত্র আন্তঃক্রিয়ার প্রয়োজন তা উধাও হয়ে গেছে। কার্যত কলেজে আজ আর শিক্ষক প্রায় নেই— রাজনৈতিক শিবিরের লোক দ্বারা অলংকৃত হয়ে আছে। কলেজ এখন ইউ জি সি-র দেওয়া বিপুল অর্থে সুসজ্জিত আড্ডা স্থল হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

বামফ্রন্ট প্রশাসনে তৈরি হওয়া শিক্ষাক্ষেত্রের এই ব্যবস্থা শাসক শ্রেণী পরিবর্তিত হলেও আরো জোরদার হয়েছে, কুৎসিত হয়েছে, সিপিআই(এম) অপশাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসী এক হয়ে যে পরিবর্তন এনেছিল তৃণমূল প্রশাসন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে কার্যত সম্প্রসারিত সিপিআই(এম) শাসক হিসেবে। দেশবাসী কি এইভাবে 'From Frying pan to Fire অথবা 'From fire back to frying pan' এ ফিরে আসবে? না এক সার্থক বিকল্পের চিন্তা করবে? যেকোনো ক্ষেত্রেই দুষ্ট গ্রহের কবলে পড়ার সম্ভাবনা থেকে দেশবাসীকে সদা জাগ্রত থাকতে হবে। বর্তমান প্রশাসনের স্পর্ধিত ঘোষণা যা এতাবৎ কোনো প্রশাসনের সময় শোনা যায়নি তা হলো সরকার মাইনে দেয় তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তার যা প্রয়োজন মনে হবে অর্থাৎ হস্তক্ষেপ চলবে। অথচ আমরা জনি কোঠারী কমিশন বার বার ঘোষণা করেছে— শিক্ষক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই কোনো অর্থনৈতিক খবরদারি বা প্রভুত্বমূলক আচরণ চলবে না। এই অধঃপতিত মানের শিক্ষা প্রশাসনকে বিদায় করা কর্তব্য শিক্ষার স্বার্থে।

পশ্চিমবঙ্গে স্কুল-পাঠ্যপুস্তক

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ॥ প্রথমেই বলি, আজিকার শিক্ষা লক্ষ্যভ্রষ্ট। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই; কোনো উদ্দেশ্য নাই। কেন আমি শিক্ষা গ্রহণ করিব, তাহার কোনো সদুত্তর নাই। শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কী হইবে তাহা শিক্ষকও বলিতে পারেন না। ইংরাজ বলিয়াছেন, কেরানি হইবে। বর্তমান শিক্ষা তাহাও বলিতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির নাই বলিয়া শিক্ষিতেরও লক্ষ্যস্থির নাই। শিক্ষিত ব্যক্তির আচার-আচরণ দেখিলে মনে হয়, ইহারা মনুষ্যেতর কোনো জীব হইবে।

এরাজ্যে প্রচলিত স্কুল পাঠ্যপুস্তকের কথাই ধরা যাক। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক একটু মন দিয়া দেখিবেন। কোথাও কিছু শিখিবার নাই। শিক্ষার নামে ইনফরমেশনের জঙ্গলে তাহাকে ঢুকাইয়া দিয়া আমরা মজা দেখি। বেচারা সেই জঙ্গলে টিচার-প্যারা-টিচার, পার্টটাইম টিচার, প্রাইভেট-টিউটর প্রভৃতি শ্বাপদ-আপদের পাল্লায় পড়িয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া কোনোরকমে পড়ি-মরি করিয়া বাহির হইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। শুধু তাহাই নহে, পুস্তকের মধ্যে যাহা আছে, তাহা শিক্ষার্থীর শিক্ষার আগ্রহে জল ঢালিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। আজি হইতে দশ বৎসর পূর্বের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এমন নির্বিকল্প সমাধির সোপান ছিল না।

মাতৃভাষার কথা বলি। পূর্বের প্রগতিশীল সরকার তো 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ' বলিয়া ছাত্রছাত্রীদের আমৃত্যু মাতৃদুগ্ধ পান করাইয়া গেল। ফলে শিশু চিরকাল শিশু হইয়া রহিল। আর তাহাকে কোলে নাচাইয়া, লাল-লালিপপের লোভ দেখাইয়া দেশের দুধ-সর-ছানা-মাখন যেটুকু ছিল নেতারা সাবাড় করিয়া দিল। সর্বহারা সর্বহারাই রহিয়া গেল। ইহারই নাম বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ। ইহার স্লোগান হইল— 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আমরা খাবো, তোমরা বাদ।'

তাহারা সর্বহারাকে সর্বহারাই করিয়াছিল। কারণ বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ ইহার বেশি কিছু করিতে পারে নাই। আর পরিবর্তিত সরকার মা ও মানুষকে মাটি করিয়া দিল। তাহার সহস্র নমুনা আজিকার বাঙলা স্কুলপাঠ্য পুস্তকের পাতায় পাইবেন। এই পাঠ্যপুস্তক পাতিয়া মাতৃভাষা শিক্ষার সপিণ্ডীকরণ হইতেছে। একটিও গদ্য, একটিও পদ্য পড়িয়া শিক্ষার্থী শিশু আনন্দ পায় না।

With Best
Compliments
from -

A
Well Wisher

B.M.

সাধারণ রোগবালাইয়েরও সহজলভ্য চিকিৎসা দেওয়া হয়ে উঠছে না

ডাঃ অভিষেক ব্যানার্জী

ভারতবর্ষ তথা এশিয়ায় অ্যালোপাথিক চিকিৎসার পথিকৃৎ এই বাংলা। ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়রা একদিন দেশ ও জাতিকে গর্বিত করেছিলেন, তাদের মেডিক্যাল শিক্ষার সূচনা ও কর্মকাণ্ড এই বাংলাতেই ।একসময় মেডিসিন ও সার্জারি— দুই ক্ষেত্রেই সারা দেশের মানুষের 'শেষ ভরসা' ছিলেন কলকাতার ডাক্তাররা। ডাক্তারি পড়ুয়ারা জানেন, এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত সর্বভারতীয় তথা এশিয়া ও আফ্রিকায় চালু মেডিক্যাল শিক্ষার পাঠ্যবইয়ের লেখকদের সিংহভাগ ছিলেন বাঙালি। কিন্তু আজকের তারিখে দাঁড়িয়ে কী মেডিক্যাল শিক্ষা, কী সার্বিক স্বাস্থ্যপরিষেবা— সবদিক দিয়েই বাংলা পিছনের সারিতে। চিকিৎসায় বাঙালিরা ভরসা আজ দক্ষিণ ভারত। কারণটা কী? একটা একটা করে কারণ তুলে ধরা যেতে পারে—

(ক) প্রথমেই বলতে হয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবনতির কথা। গ্রামেগঞ্জের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো প্রায় ভূতের বাড়ির মতো পড়ে আছে। পরিকাঠামো, ওষুধ, সেবাকর্মীদের অভাব প্রচণ্ড। ফলে প্রায়শই ডাক্তারবাবুরা ওইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে অনিচ্ছা দেখান। কারণ, চিকিৎসাব্যবস্থা শুধু একজন ডাক্তারকে নিয়ে সম্পূর্ণ হয় না, একজন নার্স, ড্রেসার বা আয়ার ভূমিকা সেখানে কোনো অংশে কম নয়।

ফলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় কোমাস্তরে। সামান্য পেটব্যথা, জ্বরের ওষুধ— তার বেশি কিছু হলেই, সোজা রেফার— গ্রামীণ বা ব্লক হাসপাতাল।

(খ) ব্লক হাসপাতালের সমস্যার শুরুও এখান থেকেই।

যে ডায়রিয়ার রোগীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই চিকিৎসা দেওয়া যেত, তার শুশ্রূষা করতে গিয়ে ব্লক হাসপাতালের নিজস্ব 'টার্গেট পেশেন্ট'দের যতটা পরিষেবা দেওয়া দরকার সেটা সম্ভব হয় না।

এছাড়াও রয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব। তার ফলে সামান্য অ্যাপেন্ডিসাইটিস, হাইড্রোসিল অপারেশনের জন্যও মানুষকে দৌড়াতে হচ্ছে সদর হাসপাতালে বা মেডিক্যাল কলেজগুলোয়।

হাসপাতালে বেড না পেয়ে মেঝেতেই চলছে স্যালাইন।

(গ) সারা পশ্চিমবাংলার ৩৪১টা ব্লকের এই জমে থাকা রোগীর স্রোত যখন হাতে গোনা কয়েকটা মেডিক্যাল কলেজ বা জেলা হাসপাতালে আছড়ে পড়ে, তখন সেগুলোর পরিকাঠামোও স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়ে। ফলস্বরূপ দেখা যায়— আগের দিন রাত থেকে লাইনে দাঁড়ানো রোগী, হাসপাতালের মেঝেতে, সিঁড়িতে পর্যন্ত রোগী ভর্তি নেওয়া, মেঝেতে শুয়ে থাকা মায়ের পাশ থেকে সদ্যোজাতকে তুলে নিয়ে বিড়ালের চলে যাওয়া, চিৎকার-চেঁচামেচিতে মাছের বাজারকেও হার মানানো হাসপাতালের ওয়ার্ড। মেডিক্যাল কলেজগুলোতে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত আউটডোর করেও ডাক্তারবাবুরা ভিড় সামলাতে পারেন না। শুরু হয় অসন্তোষ।

এই সঙ্গেই জুড়ে যায় মেডিক্যাল শিক্ষারও ভবিষ্যৎ। কারণ মেডিক্যাল কলেজগুলোই ভাবী চিকিৎসক তৈরির প্রতিষ্ঠান। সেখানে ভর্তি হওয়া দরকার কেবলমাত্র জটিল রোগীদের বা সেইসব রোগীদের যাদের চিকিৎসা করতে করতে ডাক্তারি পড়ুয়ারা শিখতে পারবেন ডাক্তারি শাস্ত্রের খুঁটিনাটি। স্ট্রোক, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, গলব্লাডারের রোগীদের ভিড়ে সেইসব রোগীরা হারিয়ে যান। তাছাড়া রোগীর চাপ এত বেশি যে মেডিক্যাল টিচাররা রোগী দেখবেন না ছাত্র পড়াবেন? ফলে ভাবী প্রজন্মের ডাক্তার ও রোগী উভয়ের জন্যই আমরা তৈরি করে রেখে যাচ্ছি আরেকটা সমস্যা। এইসব সমস্যার মূল খুঁজতে গেলে কিন্তু সেই গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকে পরিকাঠামোর উন্নতি, আরো বেশি করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৈরি করা, তাদের কাছে গ্রামের চাকরি আকর্ষণীয় করে তোলা, ওষুধ ও সেবাকর্মীদের অপ্রতুলতা দূর করা— এসব না করে কেটি কোটি টাকায় কয়েকটা মাল্টি/সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তুললেও কাজের কাজ কিছু হবে না। রোজকার সাধারণ রোগবালাইয়ের সহজলভ্য চিকিৎসা মানুষকে দিতে না পারলে আমরা যে তিমিরে আছি সে তিমিরেই থাকবো।

সরকারি হাসপাতালগুলো এখন দলীয় কার্যালয়

দেবব্রত ঘোষ॥ মমতা আবার স্বাস্থ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তাঁর সাড়ে চার বছরের শাসনকালে সরকারি হাসপাতালগুলো তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে যেখানে তৃণমূল নেতা ডাঃ নির্মল মাজিই শেষ কথা। আসানসোলের সরকার নিয়ন্ত্রিত মহকুমা হাসপাতালে মাত্র আড়াই মাসের শিশু অঙ্কুর শীট নিউমোনিয়ার চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিল। ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্যদের গাফিলতির জন্য ওই শিশুটির একটা হাত বাদ হয়ে গেল। তাদেরকে শুধু লোক দেখানো শোকজ করা হলো। মুখ্যমন্ত্রী একটা দুঃখজনক শব্দও উচ্চারণ করলেন না। কারণটা সহজেই অনুমেয়— এঁরা কেউ মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি হতো মুখ্যমন্ত্রী অঙ্কুর শীটের পরিবারের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষতিপূরণ দিতেন, ডাক্তার-নার্সরা পার পেয়ে যায় তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকার জন্য। ডাক্তার ধর্মঘটে আর জি কর হাসপাতালে ২ জন রোগীর মৃত্যুতেও মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার কারণ ওই রোগীরা হিন্দু, সংখ্যালঘু নন্।

মমতার জমানায় সরকারি হাসপাতালে কয়েকটা বিল্ডিং বাড়ানো হয়েছে। সাদা নীল রং করা হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা বাড়া তো দূরের কথা আরো খারাপ হয়েছে। হাসপাতালে দালাল চক্র আরো বেশি সক্রিয় হয়েছে। রোগীদের প্রতি গাফিলতি ও দুর্ব্যবহার আরো বেড়েছে। হাসপাতালে বেড পাওয়া যায় না, সময়মতো ডাক্তাররা আসেন না, নার্সদের সংখ্যা ও গুণমান নিম্নমুখী, ওষুধ অমিল। কলকাতার হাসপাতাল, মফঃস্বল শহরের হাসপাতাল সর্বত্র একই হাল পরিষেবার। এখানে আবার তৃণমূলের ডাক্তার নির্মল মাজিই শেষ কথা। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য। কাজেই তিনি বেআইনি বা অনৈতিক কাজ করলেও সাতখুন মাপ যেমনটা হয়ে থাকে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় বা বীরভূমের রাজা অনুব্রত মণ্ডলের ক্ষেত্রে। চিকিৎসা বিভাগে যন্ত্রপাতি নেই, থাকলে হয় অকেজো বা আংশিক বিকল। Expiry date পেরনো ওষুধ দেওয়া হয় রোগীদের। মমতার বক্তব্য— এগুলো বানানো গল্প।

রোগীস্বার্থের চেয়ে পার্টির স্বার্থেই বেশি নজর

লক্ষ্য	লক্ষ্যভ্রষ্ট
▯ ১৯১৪ সালের বেঙ্গল মেডিক্যাল আইন অনুযায়ী রাজ্যের চিকিৎসকদের ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন দেওয়া। ▯ রাজ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষার মান দেখভাল। ▯ চিকিৎসায় অবহেলা, ত্রুটি এবং রোগীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা গ্রহণ।	▯ গত ১০ বছরে চিকিৎসায় গাফিলতি সংক্রান্ত ৫১৮টি অভিযোগ দায়ের। ▯ ২৮৫টি মামলার (৫৫%) নিষ্পত্তি হয়নি। ▯ ৫২টি মামলার (১০%) কোনো শুনানিই হয়নি। ▯ অভিযুক্ত ৫৩৬ জন চিকিৎসকের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাত্র ৩৪ জনের (৬.৩%) ক্ষেত্রে ▯ ২০১১ সালের জমা পড়া ১৮টি (গত বছরের ৩১ মে পর্যন্ত) মামলার মধ্যে একটির নিষ্পত্তি হয়নি।

*** তথ্যসূত্র :** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল।

রাজ্যে ফেলা যায় ১৫০০০ লিটার রক্ত

- ৩০-১০০ মিলি রক্ত শিশুদের লাগে। ৩৫০ মিলির প্যাকেটের বাকি রক্ত ফেলা যায়।
- ৮ লিটার রক্ত শুধু বিসি রায় শিশু হাসপাতালেই রোজ নষ্ট হয়।
- গোটারাজ্যে দৈনিক ফেলে দেওয়া রক্তের পরিমাণ ৪০ লিটার কমপক্ষে । বছরে ১৫ হাজার লিটার।
- মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রতিটি ওয়ার্ডে সপ্তাহে কমপক্ষে দু' ইউনিট রক্ত ফেলা হয়।
- কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজে অন্তত ১২০ প্যাকেট (৪২ লিটার) রক্ত অপচয় হচ্ছে। কেবল কলকাতাতেই বছরে দু' হাজার লিটার রক্ত ফেলা হয়।

তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি তাঁর দলনেত্রীর মদতে ও প্রশ্রয়ে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবাকে শেষ করে দিয়েছেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ১৮২ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে যেখানে অতি বিখ্যাত মানুষদের প্রত্যেকের জন্য এক পাতা জায়গা বরাদ্দ সেখানে নির্মল মাজির মতো অতি সাধারণ ডাক্তারের জন্য ৭ খানি পাতা বরাদ্দ হয়েছে। সেখানে অসংখ্য ভুল, বানান ভুল, তথ্য ভুল, ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের কোনো অর্থ নেই, গ্রামারে ভুল ছাড়াও রয়েছে আত্মশ্লাঘা, আত্মপ্রচার ও মিথ্যেকথন। কারুর কিছু বলার সাহস নেই কারণ এই ডাক্তার মাজির হাতে বিশাল বিস্তৃত ক্ষমতা। ডাঃ অর্পিতা রায়চৌধুরীর মতো স্বনামধন্য ও বিখ্যাত নেফ্রোলজিস্ট চিকিৎসককে পিজি হাসপাতাল থেকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে বদলি করে ছিলেন যেখানে Nephrology পড়ানোও হয় না। অর্থাৎ ডাঃ অর্পিতা রায়চৌধুরীর মতো বিশেষজ্ঞকে কর্মবিহীন করে দেওয়া হলো। অপরাধ তিনি পিজি-তে কুকুরের ডায়ালেসিস করাতে রাজি ছিলেন না। স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বিকার। তার শুধু গদি চাই।

গত পাঁচ বছরে মমতা সরকারের ব্যর্থতা

আইন শৃঙ্খলার অবনতি :

(ক) বাম আমলের সমাজবিরোধীরাই দলবদল করে আজ তৃণমূলে। পুলিশ ও প্রশাসনের সক্রিয় সহায়তায় তারা একই রকম সন্ত্রাস কায়েম করেছে রাজ্য জুড়ে।

(খ) বে-আইনি অস্ত্র উদ্ধারের দাবি করে ক্ষমতায় আসা তৃণমূলের হাতেই আজ সেই অস্ত্রভাণ্ডার।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিংসা সৃষ্টি করে ছাত্র সংসদ দখল থেকে গণটোকাটুকির পরিচালনা সবই চলছে তৃণমূলীদের সহায়তায়। ছাড় পাচ্ছেন না শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে অধ্যক্ষ পর্যন্ত।

(ঘ) শুধু তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডারাই নয়, বিশিষ্ট তৃণমূল নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন পুলিশকে বোমা মারার, মহিলাদের ধর্ষণ করিয়ে দেওয়ার। চলছে থানা আক্রমণ, বিজেপি নেতা কর্মীদের উপর পুলিশি ও তৃণমূলী সন্ত্রাস, অথচ তৃণমূলনেত্রী নির্বিকার।

(ঙ) দেশের মধ্যে রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। তৃণমূলী সন্ত্রাসে আক্রান্ত সংবাদমাধ্যমও।

(চ) গার্ডেনরীচ, খাগড়াগড়, কালিয়াচক প্রভৃতি কাণ্ডে দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে তৃণমূল আঁতাত স্পষ্ট হওয়ার পরও প্রমাণ লোপাটে ব্যস্ত রাজ্য প্রশাসন। জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য নিষিদ্ধ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যকে রাজ্যসভার সদস্যও করেছেন তৃণমূল নেত্রী।

নারী নির্যাতনের স্বর্গরাজ্য :

(ক) দেশে নারীধর্ষণ ও খুনের নিরীখে পশ্চিমবঙ্গ সবার আগে।

(খ) পার্ক স্ট্রিটে মুখ্যমন্ত্রীর 'সাজানো ঘটনা' তত্ত্বের বিরোধিতা করায় সরিয়ে দেওয়া হলো দময়ন্তী সেনকে। অথচ ধর্ষণ প্রমাণিত হলেও আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি অভিযুক্ত।

(গ) কাটোয়ার নির্যাতিতা বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে তৃণমূল নেত্রীর তত্ত্ব ছিল 'ওর স্বামী সিপিএম করে।' পুলিশের লঘু করে সাজানো কেস ডায়েরির ফলে বেকসুর খালাস পায় অপরাধীরা।

(ঘ) কামদুনীর প্রতিবাদী জনগণ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর চোখে মাওবাদী।

(ঙ) রানাঘাটে বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের ক্ষেত্রে প্রথমে বিজেপি-কে দোষারোপ করলেও ধর্ষকদের তৃণমূল যোগ প্রমাণ হতেই মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ।

(চ) ধূপগুড়ি, কৃষ্ণগঞ্জ, বীরভূম, বারাসাত, জামুরিয়া বিভিন্ন স্থানে 'তাপস পালের ছেলেদের' অবাধ বিচরণ নারী-নির্যাতনের তালিকাকে প্রতিদিনই দীর্ঘতর করে চলেছে। প্রশাসনের মদতে সালিশি সভার মাধ্যমে মিটমাট করাতে বাধ্য করা হচ্ছে নির্যাতিতাদের পরিবার।

আর্থিক দুর্নীতি :

(ক) বাম আমলে জন্ম নেওয়া সারদা, রোজভ্যালি, এমপিএস-সহ কয়েকশো চিটফান্ড ও গ্রামেগঞ্জে গড়ে ওঠা কো-অপারেটিভগুলি তৃণমূলী যত্নে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রতারিত। দুর্নীতি লুকিয়ে রাখতে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ এসআইটি নথিপত্র লোপাট করার মরিয়া চেষ্টা করেছে। অবশেষে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত হওয়ায়

নারী পাচারে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ

* ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গে ২৮ হাজার নারী ও শিশু পাচার হয়েছে যাদের মধ্যে ১৯ হাজার জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

* ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৩ হাজারেরও বেশি নারী পাচার হয়েছে।

* সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হিসেবে ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯ হাজার নারী ও শিশু পাচার হয়েছে যাদের মধ্যে মাত্র ৬ হাজার জনকে খুঁজে পাওয়া গেছে।

* কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ২০০৯ থেকে ২০১১ সালে শিশু ও নারী পাচারে দেশের মধ্যে প্রথম ছিল।

নারী নিগ্রহ
গত দু'বছরে (২০১২-১৪)
গোটা দেশের মধ্যে এক নম্বর
পশ্চিমবঙ্গ

২০১২-১৪— ১৬৫৬টি ধর্ষণ মামলা নথিভুক্ত। ১৮৪৮ জন গ্রেপ্তার। দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মাত্র ৫৭ জন।

ধর্ষণের মামলায় সাজা দেওয়ায় দেশের মধ্যে ২৯টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান— ২৮ তম।

শাসক দলের সাংসদ, মন্ত্রী একে একে গ্রেপ্তার হয়েছে।

(খ) ত্রিফলা কাণ্ড, ত্রিনেত্র কাণ্ড, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে টেট কেলেঙ্কারি, কলেজে ছাত্র ভর্তি করতে তোলা আদায়, সবই হয়েছে তৃণমূল নেতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধানে।

রাজ্যের অর্থসঙ্কট :

(ক) ৩৪ বছরের বাম শাসনে রাজ্যে ঋণ ছিল ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। গত সাড়ে চার বছরে খেলা, ক্লাব, মেলা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দান খয়রাতি করার ফলে সেই ঋণের বোঝা আরও ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা বেড়ে প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে।

(খ) তৃণমূল নেত্রীর জেলা ভ্রমণ, মোসাহেব পরিবৃত হয়ে বিদেশ ভ্রমণের অপব্যয়ে রাজ্যের অর্থসংকট আরও তীব্র।

(গ) ভোটের সময় মস্তানরাজ কায়েমের লক্ষ্যে ক্লাবগুলিতে দান খয়রাতির ফলে অর্থভাণ্ডার শূন্য, নেই আয় বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ। কেন্দ্র সরকারের উন্নয়ন খাতে প্রদত্ত অর্থও সঠিকভাবে ব্যয় করতে অক্ষম রাজ্যের তৃণমূল সরকার।

বেকারত্ব :

শিল্প বিকাশ না হওয়ায় বেসরকারি ক্ষেত্রে তৈরি হয়নি কোনো নতুন কর্মসংস্থান। সরকারি নিয়োগও প্রায় বন্ধ। অর্থের বিনিময়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ যুব সমাজে তৈরি করেছে চরম হতাশা। এই হতাশ যুব সমাজকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিচ্ছেন চপ-তেলেভাজার শিল্প করার পরামর্শ।

পঞ্চায়েত দুর্নীতি :

পঞ্চায়েত আজ দুর্নীতির আখড়া। সে ১০০ দিনের কাজই হোক বা ভুয়ো বিলের মাধ্যমে তহবিল তছরূপ।

প্রতি চারটি রাজনৈতিক হত্যার একটি এরাজ্যে

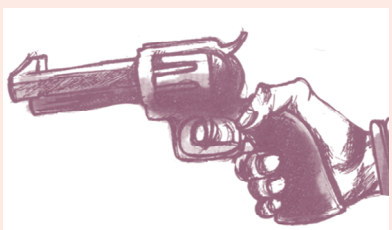

বাম আমল থেকেই ছুতোয়-নাতায় যে রাজনৈতিক আক্রোশ বা হিংসার ধারা শুরু হয়েছিল, তৃণমূল রাজত্বেও সেই প্রথার অবসান হয়নি। মা-মাটি-মানুষের 'বদলা নয়, বদল চাই'-এর স্লোগান বর্তমানে মাটিতেই মিশে গেছে। বিরোধী দলকে শায়েস্তা করা থেকে শুরু করে অতি সম্প্রতি কলকাতার বুকে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তৃণমূলেরই এক সমর্থকের চপার দিয়ে পা কেটে নেওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ প্রশাসনের হতশ্রী চেহারাটা আবারও সর্বসমক্ষে চলে এসেছে। রাজনৈতিক হিংসায় পশ্চিমবঙ্গ আজ গোটা দেশে প্রথম সারিতে উঠে এসেছে। এন সি আর বি-র রিপোর্টই বলছে, ২০১৪ সালে প্রতি চারটি রাজনৈতিক হত্যার একটি এ রাজ্যে ঘটেছে। এমনকী বিহার, মধ্যপ্রদেশেও ২০১৪ সালের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে রাজনৈতিক হত্যার পরিসংখ্যান অনেক কমে গিয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিহার বিধানসভা নির্বাচনে উত্তেজনার পারদ চড়লেও রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেনি। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ভোট ঘোষণার পর থেকেই কোথাও অস্ত্র উদ্ধার, কোথাও বোমা বাঁধতে গিয়ে দুর্ঘটনা, আবার কোথাও রাজনৈতিক হত্যার যে ঘটনা পরম্পরা দেখা যাচ্ছে, তা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এক অশনি সংকেত বহন করছে।

খোদ কলকাতাতেই দেদার বেআইনি অস্ত্র আমদানি হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভিনরাজ্যের ও আন্তর্জাতিক অস্ত্র, বিস্ফোরক ব্যবসায়ীদের সক্রিয়তা বাড়ছে। বাংলাদেশ, নেপাল, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও অন্যান্য জায়গা থেকে শুধু মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, বর্ধমানের মতো জেলাতেই নয়, খোদ কলকাতা শহরেও অস্ত্র, বিস্ফোরক ঢুকছে। ভোটের ঠিক আগে খাস কলকাতায় চলন্ত বাস থেকে গুলি ও আগ্নেয়াস্ত্র-সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিহার থেকে আমদানি হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে গিয়ে দুষ্কৃতীদের মারধরে জখম হয়েছেন এক পুলিশকর্মী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের কাছে বিহারের নওয়াদা থেকে আসা বাসটিকে আটকায় জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ। বাসের মধ্যে ফলের কাটন থেকে উদ্ধার হয় দুটি পাইপগান ও আটটি গুলি। উদ্ধার অভিযান চালাতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের মারধরে জখম হন জোড়াসাঁকো থানার ওই পুলিশকর্মী। পরে গ্রেপ্তার হয় মহম্মদ মিন্টু, শেখ রাজু, শেখ সিরাজ ও মহম্মদ জুম্মান নামে চার দুষ্কৃতী। এদের মধ্যে মহম্মদ মিন্টু বিহারের নওয়াদার বাসিন্দা। বাকিরা জোড়াসাঁকো থানার কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সুলংগুড়ি এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই দিনই নিউটাউনের যাত্রাগাছি এলাকার রাস্তা থেকে উদ্ধার হয়েছে ছ'টি তাজা বোমা। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেআইনি অস্ত্র ও বিস্ফোরক ছড়িয়ে আছে তা তদন্ত না করলে জানা যাবে না।

জালনোট পাচারের সবচেয়ে বড় ট্রানজিট রুট মালদার কালিয়াচক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করার জন্য জালনোট ছড়িয়ে দিচ্ছে পাকিস্তান। আর এই কুকর্মে পাকিস্তানের সঙ্গী 'ডি-কোম্পানি' অর্থাৎ দাউদ ইব্রাহিম। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান-এর তত্ত্বাবধানে বালুচিস্তানের কোয়েটা, সিন্ধু প্রদেশের করাচি, পাঞ্জাবের লাহোর এবং খাইবার পাখতুনওয়া প্রদেশের পেশোয়ারের 'গভর্নমেন্ট নোট প্রেস'-এ ছাপা হয় ভারতীয় জালনোট। গোয়েন্দা সূত্র অনুসারে প্রতিমাসে ১০০/১৫০ কোটি টাকার নোট ছাপানো হয় এই সরকারি প্রেসগুলিতে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাকিস্তানে একটি ভারতীয় নোটজাল করতে খরচ পড়ে সে দেশের মুদ্রায় মাত্র ১৮ টাকা। তাই আগে ৫০ এবং ১০০ টাকার নোট ছাপানো হলেও, এখন ওই একই খরচে শুধুমাত্র ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট ছাপানো হচ্ছে।

পশ্চিমভারতের পাক সীমান্ত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের নেপাল সীমান্তে কড়া নজরদারির

কারণে এখন মালদহ জেলাকেই জালনোট পাচারের সবচেয়ে বড় ট্রানজিট রুট হিসাবে ব্যবহার করছে আই-এস- আই। সূত্র অনুসারে মালদহের কালিয়াচকের মোজমপুর ও মহব্বতপুর সীমান্ত দিয়েই সবচেয়ে বেশি জালনোট ঢুকছে পশ্চিমবঙ্গে। কালিয়াচকের জামশেদতলা থেকে এন আই এ গ্রেপ্তার করে মোরগেন শেখ ও রকিব শেখ নামে দুই ব্যক্তিকে। তাদের জেরা করে এন আই এ জানতে পারে, দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং উত্তরপ্রদেশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই জালনোট কারবারের চক্র। গত ২ বছর ধরে জালনোট কারবারের যতগুলি চক্র ধরা পড়েছে, তার প্রতিটির সঙ্গেই সংস্রব রয়েছে মালদহের। গরিব ঘরের কিশোর-যুবকদের নির্মাণ শ্রমিকের কাজ দেওয়ার জন্য ভিন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে এই কারবারের কুরিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে সীমান্তবর্তী গ্রামের গরিব পরিবারের মহিলাদেরও নামানো হচ্ছে জালনোট কারবারে। গত কয়েক মাসে শুধুমাত্র কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর সীমান্ত এলাকা থেকে এরকম কাজে লিপ্ত ৩৭ জন মহিলাকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে দিয়েছে বি এস এফ লিগাল অ্যাকশনের জন্য।

জানা গেছে, এরাই ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। জঙ্গি কার্যকলাপেও সেই জালনোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। কয়েকটি মামলায় সেই যোগসূত্রের সন্ধান মিলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বোমা-বন্দুকের রমরমা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আর এক সপ্তাহ পরেই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আবার 'হার্মাদ'-রা তৎপর হয়ে উঠছে। হাতে তাদের বাংলার খুব চালু রাজনৈতিক অস্ত্র—বোমা আর বুলেট। রাজ্যের মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়াতে রয়েছে অস্ত্র তৈরির কারখানা, হয়ে উঠেছে চোরাচালানের কেন্দ্র। উল্লেখ্য, তিনটি জেলাই সীমান্তবর্তী। মাঝে মধ্যেই খুন বিস্ফোরণ, তাজা বোমা উদ্ধারের খবর কাগজের শিরোনামে আসে।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম— এককথায় রাঢ় বাংলা এখন মাওবাদী প্রভাবিত অঞ্চল। বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে এখানে জমা করা হয়। আর বীরভূম হচ্ছে মারপিট-হামলা— জোর যার মুলুক তার।

এক নজরে বিভিন্ন জেলার হিংসাত্মক ঘটনাগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে :

- মালদায় নির্বাচন হবে ১১ এপ্রিল। এরই মধ্যে লাইসেন্স বিহীন ২১০০ বন্দুক থানায় জমা পড়ছে। বাংলার যে কোনো জেলার থেকে মালদা এ ব্যাপারে সবার আগে।
- ১৭ মার্চ, মুর্শিদাবাদের সেকেন্দ্র গ্রামের এক মাঠ থেকে ৩০টি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। ওই একই দিনে মালদা থেকে তৃণমূল নেতা সুবোধ প্রামাণিককে ৩ কোটি টাকা মূল্যের আফিম এবং কয়েকটা বোমা রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি। কলকাতায় লরেটো স্কুলের ঠিক বাইরে প্রকাশ্য দিবালোকে দু'জন বাইক আরোহীর অতর্কিত আক্রমণে একজন তৃণমূল কর্মী নিহত হন।
- ৫ ফেব্রুয়ারি। বীরভূমে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে বোমা ও বন্দুক দুইই। এই জেলারই রসুলপুর থেকে ২৭টি বোমা উদ্ধার করা হয়।
- ১ ফেব্রুয়ারি। বীরভূমের তৃণমূল নেতা সরোজ ঘোষের বাড়ি থেকে কমপক্ষে ৮০টি তাজা বোমা ও বোমা তৈরির মশলাপাতি উদ্ধার করা হয়।
- ২০ মার্চ। মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার বিন্দারপুর গ্রাম থেকে ২০টি তাজা বোমা উদ্ধার। অভিযুক্ত তাঞ্জিলা বিবি এলাকায় তৃণমূল সমর্থক বলেই পরিচিত।
- ২২ জুন। বীরভূমে তৃণমূল নেতা জাবির হুসেনের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে ২ জন ব্যক্তি নিহত হয়।
- ২৮ ডিসেম্বর। মালদাতে এক অবৈধ ভাঙা বাড়িতে বোমা-বিস্ফোরণে দুজন নিহত হয়। তৃণমূলের আঞ্চলিক সভাপতি নফজুল আলমের এক আত্মীয় আহতদের একজন। শতাধিক বোমা উদ্ধার করা হয়েছে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

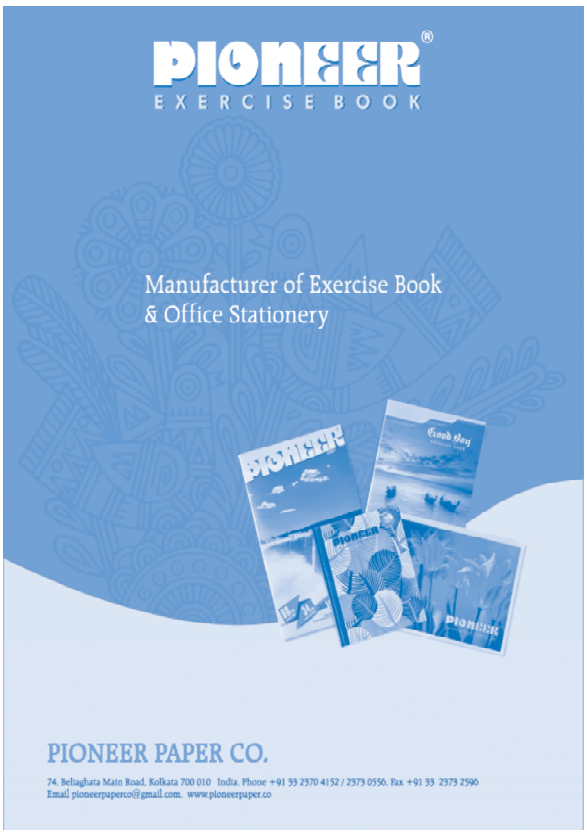

‘একদিক দিয়ে হিন্দুধর্ম প্রতীক উপাসনার একটি বিরাট শিক্ষালয় ব্যতীত আর কিছু নয়। এই প্রতীক ধর্মের আবেদন বিশ্বজনীন। চিত্রটি যে ভাষাতেই ব্যাখ্যাত হোক, পাঠক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বা নিরক্ষর যাই হোন, চিত্রটি নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করে থাকে এবং তা করে নির্ভুলভাবেই।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে মোদী সরকারের সাফল্যকে হাতিয়ার করছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল ও পণ্ডিচেরী— এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে কেন্দ্রে মোদী সরকারের সাফল্যকেই মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বিজেপি। মূলত আর্থিক সাফল্য এবং জনধন অ্যাকাউন্ট যোজনা, অটল পেনশন যোজনা এবং মুদ্রা ব্যাঙ্কের মতো সামাজিক প্রকল্পগুলিকে জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে। এই প্রকল্পের সুবিধা দেশের প্রত্যেকের অতিরিক্ত হাতিয়ার। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র তরফে মূল হাতিয়ার ছিল মোদীর কাছ থেকে জনগণের প্রত্যাশা। মোদী সরকারের একটি স্লোগান 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'— সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সবার উন্নতি, যাতে কোনো ধর্ম বা জাতির ভেদাভেদ নেই। সরকারের কাজ তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

১। কল্যাণ, ২। সুরক্ষা। ৩। সম্মান।

মানুষের কল্যাণের ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য গৃহীত জনসুরক্ষা প্রকল্প :

* **প্রধানমন্ত্রী জনধন প্রকল্প :** বিনা পয়সায় ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট, ডেবিট কার্ড, সহজে ছোট ঋণ, ৩০ হাজার টাকা সাধারণ বিমা, ১ লক্ষ টাকা দুর্ঘটনা বিমা, পশ্চিমবঙ্গে আজ অবধি মোট অ্যাকাউন্ট এক কোটি আশি লক্ষ ও মোট জমা চার হাজার কোটি টাকার বেশি।

* **প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা :** বাৎসরিক ১২ টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিমা করলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা অঙ্গহানি হলে ২ লক্ষ টাকা বিমা পাবে। আজ অবধি গ্রামে প্রায় ৫ কোটি শহরে প্রায় ৪.৫ কোটি, মোট প্রায় ৯.৫ কোটি মানুষ বিমা করেছেন।

* **প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা :** বাৎসরিক ৩৩০ টাকার মাধ্যমে দু লক্ষ টাকার সাধারণ বিমা, আজ অবধি সাড়ে বারো কোটি মানুষ এই বিমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

* **অটল পেনশন যোজনা :** অসহায়দের জন্য Employment Talent Utilisation (সেতু) ও Atal Invention Mission.

মুদ্রা ব্যাঙ্ক :

দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, ছোট ব্যবসায়ী, বেকার যুবক-যুবতীদের ব্যবসায় ঋণদানের জন্য মুদ্রা ব্যাঙ্ক যার মাধ্যমে দশ হাজার টাকা থেকে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যেতে পারে। এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সতেরো লক্ষের বেশি তরুণ তরুণী এই ঋণ গ্রহণ করেছেন যার পরিমাণ পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

আমাদের কন্যা আমাদের গর্ব : তাই যোজনা—

* বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও।
* সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা।
* মহিলাদের সুরক্ষার জন্য হিম্মত সেফটি অ্যাপ চালু করা।
* দিল্লী সহ সমস্ত কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে পুলিশ বিভাগে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করা।

আজকের যুবক আগামী দিনের ভবিষ্যৎ :

* স্কিল ইন্ডিয়া : যুবক-যুবতীদের বিশেষ ট্রেনিং-য়ের মাধ্যমে দক্ষ ও শিক্ষিত করে তোলা।
* প্রধানমন্ত্রী বিদ্যালাক্ষী কার্যক্রম : উচ্চ শিক্ষার জন্য।
* বিভিন্ন বিভাগে অনলাইন কোর্স ও ই-ন্যাশনাল লাইব্রেরি চালু করা।
* ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য জাতীয় পোর্টাল তৈরি করা।
* ৫টি নতুন আই আই টি এবং ৬টি নতুন আই আই এম তৈরি করা।
* পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় শ্রমেব জয়তে প্রকল্প।

* দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কোশল যোজনা যার মাধ্যমে কুশল ভারত গড়া।

* জাতীয় দক্ষতা বৃদ্ধি মিশন।

* বিশেষ সক্ষমদের জন্য সুগম ভারত প্রকল্প।

জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান--- অটলজীর স্লোগান বাস্তাবায়নের জন্য :

* সেনা বাহিনীতে এক পদ এক পেনসন নীতি চালু করা।

* অত্যাধুনিক যন্ত্র ও যুদ্ধ বিমানসহ যাবতীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া।

'অন্নদাতা সুখী ভব' এই ভাবনার প্রয়োগ :

* প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্টের ৫০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ।

* কৃষি ঋণ পরিশোধের নিয়ম শিথিল।

* কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ও কৃষি বিমা পূর্ণভাবে চালু করা।

* মাটি পরীক্ষার জন্য Soil Health Card (মাটির স্বাস্থ্য কার্ড) চালু করা।

* প্রধানমন্ত্রী কৃষি ও সেচ প্রকল্প ও ১ লক্ষ সৌর পাম্প বসানো হয়েছে।

* গবাদি পশু প্রতিপালনে উৎসাহ দান করার জন্য 'জাতীয় গোকুল মিশন'।

* ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কিষাণ টিভি চালু করা।

* বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রীয় আবিষ্কার অভিযান'।

* পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মিশন।

* তপশিলিদের উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর।

* তপশিলি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেল, বৃত্তি চালু করা ও 'বন বন্ধু কল্যাণ' যোজনা।

* সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য 'ওস্তাদ' প্রকল্প চালু করা এবং ৮৬ লক্ষ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।

* শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট চালু করা, ই.পি.এস. এ ন্যূনতম ১০০০ টাকা পেনশন চালু ও ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর চালু করা।

Skill India

কৌশল ভারত - কুশল ভারত

সামাজিক ক্ষেত্রে ও দেশের সার্বিক উন্নতি সাধনে :

* **স্বচ্ছ ভারত মিশন :** সুস্থ ভারত, সবল ভারত, শিক্ষিত ভারত নির্মাণ। এই মিশনের মাধ্যমে সার্বজনিক ক্ষেত্র, বিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গায় এখন অবধি ৫৮ লক্ষ শৌচাগার নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেক গরিব পরিবারকে শৌচাগার তৈরির জন্য ১২,৫০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। পয়ঃপ্রণালী ও আবর্জনা পরিষ্কার এবং এই আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি প্রকল্পের জন্য সহযোগিতা করা হচ্ছে।

* **নমামী গঙ্গে প্রকল্প :** গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করা ও শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং গঙ্গার পাড় সৌন্দর্যায়নও এর মধ্যে পড়ছে।

* **দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় যোজনা :** এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা : এই যোজনা দ্বারা ২০২০ সালের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করা।

* **দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা :** প্রতি গ্রামে প্রতি ঘরে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে।

* **দেশের আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে : মেক ইন ইন্ডিয়া :** Manufacturing Sector-এ লগ্নির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জি.ডি.পি. বৃদ্ধি ও বেকারদের হাতে কাজ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা।

* **ডিজিটাল ইন্ডিয়া :** ১ লক্ষ কোটি টাকা মঞ্জুর। প্রতিক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন ও ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে গ্রামে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।

* প্রতিটি সাংসদের গ্রামদত্তক-এর মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা।

* L.P.G. Subsidy সরাসরি ক্রেতাকে পৌঁছে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে ৮২ লক্ষ মানুষ Subsidy ত্যাগ করেছে যা বি.পি.এল. ভুক্ত মানুষকে দেওয়া হয়েছে।

* নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান সম্বন্ধে ফাইল প্রকাশ।

স্বস্তিকার বিশেষ সংখ্যা

বাংলায় শিশুমন্দির

স্বস্তিকার ৪ এপ্রিল, ২০১৬ সংখ্যাটি 'বাংলায় শিশুমন্দির' বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

দাম একই থাকছে - ১০ টাকা। সত্বর কপি বুক করুন।

এনডিএ সরকার কখনই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশবিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত করবে না

অতিথি কলম

বেঙ্কাইয়া নাইডু

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে দেশের তরুণ ভোটাররা একজোট হয়ে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করার ভাবনায় ভোটের ঝুলি উজাড় করে দিয়েছিল। সকলেই জানেন তার ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস ও বামদলগুলি দেশের কেন্দ্রীয় রাজনীতির শক্তিস্থল থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই অবমাননাকর পরাজয় তাদের পক্ষে নিতান্তই দুষ্পাচ্য হয়ে ওঠে। সেইদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় ছলে বলে কৌশলে বা যে কোনো কদর্য পথের সুযোগ নিয়ে সরকারকে অপদস্থ করার খেলা। জঘন্যতম কুৎসা প্রচার করে দেশের নবীন প্রজন্ম যারা মোদীর পেছনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মনকে বিষিয়ে তোলার প্রয়াস। একই সঙ্গে সমগ্র জাতিকে বিভ্রান্ত করার বিরামহীন প্রচেষ্টা। সন্দেহ নেই সত্য সর্বদাই পবিত্র আর বলার অধিকার লাগামহীন। কিন্তু যে কোনো দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের পক্ষেই এটা একান্ত অসঙ্গত শুধু নয় অবিশ্বাস্যও বটে যে তারা নেহাতই মিথ্যের ওপর ভর করে এমন চরম কুৎসার প্রচার চালাবে? যার জলজ্যান্ত প্রমাণ দু'টি টাটকা ঘটনা। হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা আর দিল্লীর জে এন ইউ-তে চরম দেশ-বিরোধী একটি অনুষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক মিলনের মোড়কে পাচার করে তোলার অপচেষ্টা।

১০ বছর ব্যাপী নানান কেলেঙ্কারিতে লিপ্ত একটি জরদ্গব নিকম্মা সরকারের হাত থেকে দেশকে বের করার পর সরকার যখন দেশের অর্থনীতিকে পুনরুত্থানের রাস্তায় নিয়ে যেতে কোনো চেষ্টার কসুর করছে না ঠিক তখনই কংগ্রেস ও তার দোসর বামপন্থীরা নাগরিক সমাজের মধ্যে এক বানানো অস্থিরতা তৈরি করে দেশকে অশান্ত করে তোলার চেষ্টা করছে।

একথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই যে কেউই সরকারের কাজের সমালোচনা করতে পারে। এটি তার সংবিধানপ্রদত্ত অধিকার। কিন্তু বাক্স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের অছিলায় যখন কোনো রাজনৈতিক দল দেশের সংহতি ও একতার পক্ষে বিপজ্জনক ও নিরাপত্তা বিঘ্নকারী মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রছাত্রীর কু-কর্মকে নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করে তখন তার চেয়ে দুঃখজনক ও পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না।

মনে রাখা দরকার, রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীরই যে-কোনো দেশ-বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে একসুরে প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু বিষয়টা তা না হয়ে উলটে এই ধরনের দেশবিরোধী কার্যকলাপকে মদত দিয়ে রাজনৈতিক পরাজয়ের বদলা নিতে শাসক দলের বিরুদ্ধে কুৎসার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দীর্ঘকালীন প্রচার চালানো হচ্ছে।

বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। হায়! এই রাজনৈতিক দলগুলি যে দিকে সুবিধেজনকভাবে চোখ বন্ধ রেখেছে। ২০০৬ সাল থেকে হায়দরাবাদের এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় নয় করে ১১টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিশ্রুতিবান যৌবন অকালে ঝরে গেছে। এর মধ্যে তিনটি ঘটনায় নিশ্চিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে ছাত্ররা হয়রানির শিকার হয়েছিল। অন্য মৃত্যুগুলির ক্ষেত্রে আরও বহুবিধ কারণ ছিল যার মধ্যে একটি ক্ষেত্রে মানসিক অবসাদও দায়ী।

এই দুঃখজনক ঘটনাগুলি সরাসরি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চালু থাকা সিস্টেমের ত্রুটির দিকেই আঙুল তোলে। প্রমাণ করে সেই পরিকাঠামো কতটা নিষ্ঠুর। তাই একই সঙ্গে এটাও দাবি করে যে এর সংশোধন দরকার যাতে শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিবেশ বিশেষ করে আবাসিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আবহ যেন বিষাক্ত না হয়ে ওঠে। এই দিকে নজর দেওয়াই আসল বিষয়।

রোহিত ভেমুলা ও অন্য ছাত্রদের সাসপেন্ড করার কথা বলতে গেলে বলতে হয় এইচ সি ইউ-তে ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নজির এই প্রথম নয়। ২০০২ সালের একটি ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ১০ জন দলিত পড়ুয়াকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেছিল। মনে পড়বে, ২০১০ সালে ইউপিএ-য়ের শাসনকালে একটি পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার কারণে চারজন পড়ুয়াকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

রোহিত ভেমুলা ও তার চার সঙ্গীর সাসপেন্ড হওয়ার কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশদভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাদের এই রিপোর্ট থেকে চরম উদ্বেগজনক যে বিষয়টা উঠে আসে তা হলো হায়দরাবাদ ও জে এন ইউ এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই দেশের শত্রু সন্ত্রাসবাদী ইয়াকুব মেমন, আফজল গুরু ও মকবুল ভাটের দেশবিরোধী চক্রান্তকে গৌরবান্বিত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ই এই ইস্যুতে একসূত্রে বাঁধা, কেননা তারা উভয়েই এই দেশহন্তাদের স্মরণসভা ডেকে ছিল।

এখন ৯ ফেব্রুয়ারি জে এন ইউ-তে যে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন হয়েছিল তার অন্তরালে কী ছিল তা দেখা যাক। এই অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল উদ্যোক্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ''আইনকে হাতিয়ার করে আফজল গুরু ও মকবুল ভাটের যে খুন

হয়েছে তার প্রতিবাদ করা''। ভাবলে ঘৃণাও কম হয়! সঙ্গে ছিল 'কাশ্মীরে আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে সহমর্মিতা জ্ঞাপন'।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে প্রচারপত্র, হ্যান্ড বিল বিলি করা হয়েছিল তাতে এটিকে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আখ্যা দেওয়া হয়। এরপর বলা হয় ''We invite everyone to join us in protest in rage aganinst the occupation (অর্থাৎ কোনো দেশকে জোর করে অধিকার করে রাখা) and in solidarity with the valiant people of Kashmir''. এছাড়া ওই প্রচারপত্রে চরম মনগড়া ও আপত্তিজনক কথাবার্তা যেমন, কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে বন্দী অবস্থায় চারদিক থেকে রক্তস্নাত বন্দুকের বেয়নেটের মুখে আটকে পড়া বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত। হিমালয়ের যে বরফ পড়ে তা আবার গলে যায়। আবার স্তূপীকৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যায় একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস আর সৃষ্টি হয় গণকবরের। এই অঞ্চলে কোনো ডাক বিভাগ নেই (The Country without a post office), অর্থাৎ এরা মানব বিচ্ছিন্ন। এই ধরনের প্রবণতাকে যদি নিরস্ত না করা হয় সেক্ষেত্রে বিভাজনকামী শক্তিগুলি তাদের কদর্য রূপ নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। যে-কোনোও মুহূর্তে বিপন্ন হবে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি।

এমন একটা পরিস্থিতিতে কোনো সরকার তো নয়ই যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ভারতবাসীও এমন ঘৃণ্য কাজকর্ম দেখে মূক দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না।

মনে রাখতে হবে সেই ১৯৯১ সালে দিল্লী পুলিশ সাহাবুদ্দিন ঘোরি নামে জে এন ইউ-এর এক ছাত্রের আইএসআই-এর সঙ্গে জড়িত থেকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালানোর যে চক্রান্তকে ফাঁস করেছিল তা মোটেই কাকতালীয় ছিল না। এখানে আরও বলা একান্ত জরুরি যে, ১৯৮৩ সালে এক লপ্তে ৬০০ জে এন ইউ-এর ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারা ১৫ দিন তিহার জেলবাস করেছিল। ছাত্র প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে তুমুল হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু আধিকারিক আহত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বানচাল হয়ে যায় একটা গোটা শিক্ষাবর্ষ। হ্যাঁ, তখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল সেই কংগ্রেস সরকার। কত আর বলা যাবে! সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এগিয়ে চলে। ধ্বনি উঠতে থাকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'ভারত নিপাত যাক', 'ভারতকী বরবাদি তক জঙ্গ রহেগা' 'কাশ্মীর কী আজাদি তক জঙ্গ রহেগী' উত্তাল হয়ে ওঠে পরিবেশ। ক্রমে ক্রমে ভারত থেকে অসম, মণিপুর এমনকী কেরলকেও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এর পরের ঘটনা সকলেই জানেন। কানহাইয়া কুমার ওই সভায় যোগ দেওয়ার কারণে গ্রেপ্তার হন। কিন্তু তাঁকে যে যে শর্তে জামিন দেওয়া হয় আশপাশ থেকে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক সমর্থন জুটে যাওয়ায় তিনি তার থোড়াই কেয়ার করে যথারীতি এক তীব্র ভারত-বিরোধী বক্তৃতা করেন, সঙ্গে চাটনি হিসেবে যোগ করে দেন 'কাশ্মীরের নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা সেখানকার মেয়েদের ধর্ষণ করছে।'

হায়, এই সব শুনে আমাদের চিরশত্রু প্রতিবেশীর কী সুমধুরই না লাগছে! তাই বলছি, এমন একটা পরিস্থিতিতে যে সমস্ত কংগ্রেস নেতা জে এন ইউ-তে সহমর্মিতা দেখাতে গিয়েছিলেন তাদের একটু ভাবা দরকার ছিল যে সত্যটা কী! তবু এখনও তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত নইলে কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতার আরও ক্ষয় হবে।

(লেখক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)

প্রকাশিত হবে ১১ এপ্রিল, '১৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১১ এপ্রিল, '১৬

বাংলা নববর্ষ সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় জাতীয়তাবোধ

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি এসে মনে হয় ১৯৩০-এর দশকে বুঝি ফিরে গেছি। অসহিষ্ণুতা, বাক্-স্বাধীনতার কথা বলে আবার সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। 'ভারতমাতা কী জয়' বলতে অস্বীকার করা হচ্ছে। অন্যদিকে ভোগবাদী পাশ্চাত্য জগৎ এখন দিশেহারা, মধ্যপ্রাচ্যে মৌলবাদী শক্তির রণহুঙ্কার সভ্যতার সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। তাই শুধু ভারতের অখণ্ডতা ও ঐক্যের স্বার্থে নয়, বিশ্বশান্তি ও সংহতির স্বার্থেই ভারতে সুদৃঢ় জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন শক্তির বিকাশের একান্ত প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী নববর্ষ সংখ্যার বিষয়—ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সত্যনারায়ণ মজুমদার প্রমুখ।

সংখ্যাটি সংরক্ষণ যোগ্য।। সত্বর কপি বুক করুন।। দাম একই থাকছে— ১০ টাকা।

চিকিৎসা পরিষেবা ও গুণমানযুক্ত শিক্ষা সহজলভ্য হোক : আর এস এস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বার্ষিক বৈঠক গত ১১ থেকে ১৩ মার্চ, রাজস্থানের নগৌরে হয়ে গেল। দেশের সব রাজ্য থেকে ১০০০ জন প্রতিনিধি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এবং সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী) এই বৈঠকে পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন। সরকার্যবাহ শ্রী যোশী তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদনে জানান সারা দেশে এখন শাখার সংখ্যা ৫৬,৮৫৯টি। গত বছরে সঙ্ঘের বিভিন্ন শিক্ষাবর্গে ১,৩৭,৩৫১ জন স্বয়ংসেবক অংশ নিয়েছিলেন।

প্রতি বছরের মতো এবছরেও দেশের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব তিনটি এখানে পুরোপুরি প্রকাশ করা হলো।

প্রস্তাব—১

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা এবং সুলভ চিকিৎসা পরিষেবার প্রয়োজন

দেশের সমস্ত মানুষের সারাজীবন সুস্থ ও নীরোগ থাকার জন্য উপযুক্ত জীবনচর্যার অনুশীলন এবং সর্বসাধারণের জন্য চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত খুবই প্রয়োজনীয়। আজ দেশে অস্বাস্থ্যকর জীবনচর্যার কারণে নানান রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যয়বহুল হওয়ায় তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ অসংখ্য পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে অথবা পরিবারের উপার্জনশীল সদস্যের ঠিকমতো চিকিৎসা না হওয়া জন্য বহু পরিবারের ভরণপোষণও কঠিন হয়ে পড়ছে। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা এই পরিপ্রেক্ষিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

নীরোগ থাকার জন্য স্বাস্থ্যবর্ধক আহার-বিহার ও জীবনচর্যা, সাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপন, যোগ ও নিত্য ব্যায়াম এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়। শিশুদের ঠিক সময়ে টিকা (প্রতিষেধক) দেওয়া এবং সমস্তরকম নেশা থেকে সমাজ মুক্ত থাকুক—এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ । অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার মতে, স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে দেশের সচেতন নাগরিকদের এজন্য জনজাগরণের ব্যাপক প্রয়াস করা প্রয়োজন।

চিকিৎসা পরিষেবা বড় বড় শহরে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে দেশের গ্রামীণ ও দূরদূরান্ত এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবার খুবই অভাব। সুযোগ সুবিধা ও চিকিৎসাকর্মীদের অভাব এবং ভর্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধপত্রের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকার জন্য বহু সংখ্যক লোক চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। ডাক্তারি পড়ার খরচ বেড়ে যাওয়ায় দেশে চিকিৎসা পরিষেবার দুর্মূল্য এবং গুণমান ও বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাসের প্রধান কারণ। দেশে মহিলা ও শিশু-সহ সমস্ত মানুষের গুণমানযুক্ত সর্বপ্রকার চিকিৎসা পরিষেবা সহজলভ্য হওয়া প্রয়োজন। এজন্য সারাদেশে বিশেষ করে গ্রামীণ ও জনজাতি এলাকায় সমস্ত প্রকারের চিকিৎসা পরিষেবার সুচারু বিস্তার প্রয়োজন। চিকিৎসায় ধারাবাহিকতা ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের জন্য তথ্যপ্রযুক্তিরও উপযুক্ত ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন।

দেশের বহু স্থানে নানারকম সামাজিক, ধর্মীয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারা সেবা ও পরোপকারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলিতে অত্যন্ত প্রভাবী ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সমাজের মানুষের চিকিৎসা করা হচ্ছে। এরকম সেবা সংস্থাগুলিতেও সরকারের সহযোগিতা খুবই আবশ্যক। প্রতিনিধিসভা এরকম প্রচেষ্টার প্রশংসা করে দেশের শিল্পসংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন এবং দাতব্য ন্যাসগুলিকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, তাদের এভাবে আরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এভাবে সমাজ হিতে কার্যরত সংস্থাগুলিকে উৎসাহ প্রদান করা খুবই আবশ্যক।

গত কয়েক বছরে কয়েকটি রাজ্যে নিঃশুল্ক ওষুধ বিতরণ যোজনা শুরু হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের বর্তমান বাজেটে ৩০০০ জেনেরিক ওষুধ প্রস্তাব স্বাগতযোগ্য। ওষুধপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনার জন্য জেনেরিক ওষুধকে উৎসাহ প্রদান, মূল্যের ওপর প্রভাবী নিয়ন্ত্রণ এবং পেটেন্ট ব্যবস্থা মানবিক করা প্রয়োজন। ওষুধের গুণমান সুনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত ল্যাবরেটরি নিয়মিত পরীক্ষা করাও প্রয়োজন। আয়ুর্বেদিক, ইউনানি ও অন্য প্রকারের ওষুধপত্রের গুণমান এবং তার পরীক্ষা ও বিকাশও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সমস্ত দেশবাসী, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে আবেদন করছে যে, দেশের মানুষের জীবন সুস্থপ্রদ করে তোলার জন্য স্বাস্থ্যময় জীবনচর্যা, শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা, অপুষ্টি ও নেশামুক্তির জন্য সমাজ জাগরণের প্রয়াস করুন। কেন্দ্র

ও রাজ্যসরকারগুলির প্রতি আগ্রহ যে, সমস্ত রকমের চিকিৎসাপরিষেবা সর্বসাধারণের সহজলভ্য করার জন্য পর্যাপ্তমাত্রায় বিতরণের উদ্দেশ্যে আশানুরূপ পরিকাঠামোগত, নীতিগত এবং প্রক্রিয়াগত সংশোধন করতে হবে। এজন্য দেশে সমস্ত রকম চিকিৎসা পদ্ধতির সমন্বিত বিস্তার, নীতি, শিক্ষা ও গবেষণাকে উপযুক্ত উৎসাহদান এবং নিয়ামক ব্যবস্থা ও বিধিবদ্ধ শর্তগুলিকে পারদর্শিতাপূর্বক প্রচলিত করুন।

প্রস্তাব—২

গুণমানযুক্ত শিক্ষা সবার জন্য সুলভ হোক

যে-কোনো রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে শিক্ষা একটি অনিবার্য মাধ্যম। সেজন্য শিক্ষার পোষণ, পালন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব সমাজ ও সরকার উভয়ের। শিক্ষার্থীর অন্তরে বীজরূপেস্থিত গুণ ও সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাধ্যম হলো শিক্ষা। কোনো কল্যাণকারী রাজ্যের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো প্রত্যেক নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

ভারত সর্বাধিক যুব প্রজন্মের দেশ। রুচি, যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে তাদের যোগ্য শিক্ষাব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করে দেশের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তি, আর্থিক ও সামাজিক বিকাশে তাদের সহযোগী তৈরি করে নেওয়া সমাজ ও সরকারের দায়িত্ব। এখন সব অভিভাবক তাঁদের ছেলে-মেয়েদের ভালো শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। ছাত্রসংখ্যা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি হওয়ায় সুলভ ও গুণমানযুক্ত শিক্ষা দুর্লভ হয়ে পড়েছে। বিগত বছরগুলিতে সরকারের দ্বারা 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতিতে শিক্ষাকে প্রাথমিকতা না দেওয়ার কারণে লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা সংস্থাগুলি ফাঁকা মাঠ পেয়ে গিয়েছে। আজ গরিব ছাত্রছাত্রীরা সঠিক ও গুণমানযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ, সমাজে আর্থিক বৈষম্যের বারবাড়ন্ত সমগ্র দেশের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার দ্বারা শিক্ষা সংস্থাগুলির স্তর, পরিকাঠামোগত রচনা, সেবা ভাব, শুল্ক ও মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণ করার স্বায়ত্ততা ও স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে হবে যাতে এগুলির সঠিক ক্রিয়ান্বয়ন হতে পারে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা মনে করে যে, প্রত্যেক বালক- বালিকাকে মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশাত্মবোধে ওতপ্রোত, রোজগারমুখী এবং পেশাদারি শিক্ষার পরিবেশ প্রদান করা হোক। সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্তর সংশোধনের জন্য শিক্ষকদের যথাযোগ্য প্রশিক্ষণ, সমুচিত বেতন এবং তাঁদের কর্তব্যপরায়ণতা বৃদ্ধি করাও অতি আবশ্যক।

পরম্পরাগত ভাবেই আমাদের দেশে সাধারণ মানুষকে সুলভ ও গুণমানযুক্ত শিক্ষা প্রদানে সমাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও সমস্ত ধর্মীয়, সামাজিক সংগঠন, ব্যবসায় সংস্থা, শিক্ষাবিদ ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উচিত নিজেদের দায়িত্ব মনে করে এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে, সুলভ ও গুণমানযুক্ত শিক্ষার সুযোগ সবাইকে দেওয়ার জন্য সমুচিত সম্পদের ব্যবহার এবং উপযুক্ত আইনি শর্ত সুনিশ্চিত করা হোক।

প্রস্তাব—৩

দৈনন্দিন জীবনে চাই সহমর্মিতাপূর্ণ ব্যবহার

ভারত এক প্রাচীন রাষ্ট্র এবং এর চিন্তন পরম্পরাও অতি প্রাচীন। আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস হলো, এই বিশ্বের সৃষ্টি একই তত্ত্ব থেকে হয়েছে এবং প্রাণীমাত্রেরই অভ্যন্তরে সেই তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। সমস্ত মানুষ সমান। কেননা প্রত্যেকের মধ্যে একই ঈশ্বরীয় তত্ত্ব সমানভাবে পরিব্যাপ্ত। এই সত্য ঋষি, মুনি, গুরু, সাধু-সন্ন্যাসী এবং সমাজ সংস্কারকগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও আচরণের ভিত্তিতে প্রমাণিত করেছেন।

যখন যখন এই শ্রেষ্ঠ চিন্তনের ভিত্তিতে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন আচরণ নির্ধারিত হয়েছে, তখন তখন ভারত একাত্ম, সমৃদ্ধ ও অজেয় রাষ্ট্ররূপে দণ্ডায়মান ছিল। আমাদের ব্যবহারে যখন এই শ্রেষ্ঠ জীবনদর্শনের স্খলন হয়েছে, তখন সমাজের পতন হয়েছে, জাতপাতের ভিত্তিতে উচ্চ-নীচের ভাবনা বেড়েছে এবং অস্পৃশ্যতার মতো অমানবিক কুপ্রথার নির্মাণ হয়েছে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা মনে করে, প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে এই সনাতন ও শাশ্বত জীবনদর্শনের অনুরূপ সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণ করা প্রয়োজন। এরকম আচরণেই সমাজ থেকে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও পরস্পরের অবিশ্বাসের পরিবেশ সমাপ্ত হবে এবং তখনই আমরা সবাই শোষণমুক্ত, একাত্ম ও সহমর্মিতাপূর্ণ জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবো।

রাষ্ট্রের শক্তি সমাজে এবং সমাজের যে একাত্মতা, সহমর্মিতার ভাব নির্মাণ করার সামর্থ্য তা আমাদের সনাতন দর্শনের মধ্যে আছে— 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' (সমস্ত প্রাণীকে নিজের সমান মনে করা), 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং' (সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে দ্বেষরহিত ব্যবহার করা) এবং 'এক নূরতে সব জগ উপজ্যা, কৌন ভলে, কৌন মন্দে' (এক তেজ থেকে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, কে বড়, কে ছোট) অনুসারে সবার সঙ্গে আত্মীয়তা, সম্মান ও সমানতাপূর্ণ ব্যবহার হওয়া চাই। সমাজ জীবনকে সুচারুরূপে চালানোর জন্য সমাজের সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থাগুলিকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কার্যরত থাকতে হবে, আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।

সমাজ জীবনের আদর্শস্থিতির পরিপূর্ণ ভাবনা রাষ্ট্রের সামনে রাখার সময় অনেক মহাপুরুষ ও সমাজ সংস্কারক অতি প্রাচীনকাল থেকে সমতাযুক্ত ও শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে দেশ, কাল, পরিস্থিতিযোগ্য পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করেছেন। তাঁদের জীবন, জীবনদর্শন এবং কাজ আমাদের সামনে প্রেরণার পাথেয় হিসেবে রয়েছে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভা সমস্ত পূজ্য সাধুসন্ত, প্রবচনকার, বিদ্বজ্জন এবং সামাজিক কার্যকর্তাদের নিকট বিনম্র আবেদন জানাচ্ছে যে, এজন্য সমাজ জাগরণে তাঁরা সবাই সক্রিয় সহযোগী হোন। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সমস্ত নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছে যে, সমানতাপূর্ণ ব্যবহার করার এবং সেই সঙ্গে সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনকে আবেদন জানাচ্ছে তারা যেন সহমর্মিতার ভাব সুদৃঢ় করার সব রকম প্রয়াস করেন। ■

বামপন্থীদের বাক্‌স্বাধীনতার নমুনা

আজকাল স্মৃতি ইরানিকে নিয়ে বহু তথাকথিত লিবারেল সোচ্চার হয়েছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে কটুক্তি এবং উপহাসের ঝড় উঠেছে। মনুস্মৃতি ইরানি বলে ডাকা হচ্ছে, কারণ তিনি নাকি

ভারতবর্ষে মনুবাদী শিক্ষা চালু করছেন, দলিতদের হত্যা করার মতলব করছেন। এই ঘৃণা যে কতদূর যেতে পারে তা একটি কুরুচিপূর্ণ ভিডিও প্রমাণ করে দিল। একটি হিন্দি সিনেমার একটি গানের ক্লিপকে মর্ফ করা হয়েছে। একজন বাইজী অন্য নর্তকীদের সঙ্গে নাচ ও গান করছে। পরনে কিছু নেই বললেই চলে এবং তার কিরকম কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি তা আর বোধহয় বলে দিতে হবে না। সেই বাইজীর মুখের উপর স্মৃতি ইরানির মুখ বসানো হয়েছে। একজন বাবু ঘাড় নেড়ে বাহ্ বাহ্ করছে, তার মুখের উপর ছাত্রনেতা কানহাইয়ার মুখ। এই গানটি কেন ব্যবহার করা হয়েছে তার লাইনগুলি শুনলেই বোঝা যায় : ''মাইয়া যশোদা ইয়ে তেরি কানহাইয়া/তাং মুঝে করতা হায় সং মুঝে লড়তা হ্যায়। রামজি সে কৃপা সে মাই বাঁচি"। ইউ টিউবে সেটি এখন পোস্ট করা হয়েছে। বিজেপি-কে সমালোচনা করা হচ্ছে যে তারা ভিডিও নকল করেছে, কিন্তু এর বেলায় দোষ দেখতে পাচ্ছে না।

এই হচ্ছে বামপন্থীদের লেখাপড়ার ও বাক্‌স্বাধীনতার নমুনা। তাহলে যে-কোনো মেয়েরই তো এইরকম ভিডিও করে আপলোড করলেই হলো, কোনোরকম শালীনতা রীতি-নীতির বালাই না মেনে। আমার বা আপনার মা, বউ, মেয়ের এই রকম ভিডিও লক্ষ লক্ষ লোক দেখবে, আপনি প্রতিবাদ করলেই প্রগতিশীল নন, অন্যদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইছেন। একেও কি আমাদের সহ্য করে নিতে হবে?

—পাপিয়া মিত্র,
কলকাতা।

নরেন্দ্র মোদীর 'চামচা' হয়ে গর্বিত

সম্প্রতি বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অনুপম খের-কে কতিপয় সমালোচক নরেন্দ্র মোদী-র 'চামচা' বলে অভিহিত করেছেন। বাংলা ভাষায় 'চামচা' শব্দটি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়। একজন বিশিষ্ট অভিনেতার নামের সঙ্গে এই বিশেষণ প্রয়োগ করে সমালোচকরা কদর্য মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অনুপম খের, যিনি তাঁর অভিনয় জীবনে বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, তিনি তাঁর নতুন উপাধিকে সানন্দে গ্রহণ করে বলেছেন, নরেন্দ্র মোদীর 'চামচা' হতে পেরে তিনি গর্বিত।

একথা অনস্বীকার্য, নরেন্দ্র মোদী এমন একজন প্রধানমন্ত্রী, যিনি দেশবাসীর মধ্যে দেশের জন্য আবেগ সঞ্চার করেছেন। মোদীর আকস্মিক উত্থান হয়নি। পারিবারিক পরম্পরাতেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হননি। নরেন্দ্র মোদী ছাড়া লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে আজ পর্যন্ত অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের শৌচালয়ের কথা বলেননি। এটি নিঃসন্দেহে একটি সৎ প্রয়াস। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তিনি জগৎ সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে তাঁর আশৈশব সঙ্ঘের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়া। তাঁর প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ছিদ্রান্বেষণ করে যেসব সমালোচক তাঁকে নীচে নামাতে চাইছে, বলিউড অভিনেতা অনুপম খের-য়ের মতো তাদের যোগ্য জবাব দিতে হবে।

—সপ্তর্ষি ঘোষ,
৫৭, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

বাংলার হিন্দু ভোট

বাংলার হিন্দু ভোট নিয়ে আলোচনার আগে ভারতের আরো দুটি রাজ্য কাশ্মীর ও অসমের দিকে আলোকপাত দরকার। এই দুই রাজ্যে মুসলমান সংখ্যার অনুপাত বেশি, তাই সরকার গড়ার ক্ষেত্রে মুসলমান ভোটের জন্য ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু এই দুই রাজ্যে হিন্দুভোট সংগঠিত হওয়ায় সরকার মুসলমান তোষণকারী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে হিন্দু ভোট হারানোর ভয় করে। কাশ্মীরে পি ডি পি-র মতো দলকে বিজেপি-র সঙ্গে জোট করতে হয়েছে।

কিন্তু বাংলায় হিন্দু ভোট সংগঠিত না থাকায় ২৭ শতাংশ মুসলমান ভোট নিজেদের পক্ষে রাখতে মুসলমান তোষণের বিবিধ পদক্ষেপ নিয়েই চলেছে যাতে ক্ষতি হচ্ছে হিন্দুদেরই। কালিয়াচকে বহু হিন্দুর ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষতি হলে সংবাদমাধ্যম চেপে যায়, কারণ হিন্দু ভোট সংগঠিত নয়। তাই ২০১৬-তে হিন্দুভোট সংগঠিত হওয়া দরকার। হিন্দুদেরই ঠিক করতে হবে হিন্দুদের কথা ভাববে কোন সরকার। হিন্দু ভোট যেন ভাগ না হয়। এতে সামাজিক ভারসাম্যই রক্ষিত হবে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল হবে ঠিক যেমন কাশ্মীরে হয়েছে।

—পদ্মপ্রিয় পাল,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

কেন্দ্রে-রাজ্যে একই দল হলে রাজ্যের মঙ্গল

সমন্বয় সমৃদ্ধির সোপান। একক শক্তিধর মানুষ যত কাজ সম্পাদন করতে পারে অনেকে মিলে করলে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ অনেক নিখুঁতভাবে করতে পারে। একথা ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনেও তেমনই সত্য। রাজ্য রাজনীতির এই উথালপাথাল সময়েও আমরা এই নীতির সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি। রাজ্য রাজনীতিতে যে দল ক্ষমতায় আসবে সেই দল যদি কেন্দ্রীয় সরকারেও ক্ষমতাসীন থাকে

তাহলে সেই দলের পক্ষে রাজ্য চালানো সহজতর হয়। রাজ্যবাসীও অনেক বেশি নাগরিক-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। প্রথমত, স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎকাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দিল্লীর সম্পর্কের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে স্বাধীনতার পর প্রথম দু' দশক কেন্দ্র-রাজ্যে ছিল একই সরকার, তবুও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের অন্ধ বিরোধিতার জন্য রাজ্যের উন্নতিতে যথেষ্ট বাঁধা পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে অতুল্য ঘোষকে প্যাঁচে ফেলতে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ছিলেন কৃপণহস্ত। আর সাতের দশকের শেষ থেকে তো বরাবরই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অহিনকুল সম্পর্ক। এর ফল পশ্চিমবঙ্গবাসী হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করছেন। যদিও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বের সকল সরকারের ন্যায় পক্ষপাতদুষ্ট নয়, তবুও কেন্দ্র-রাজ্যে এক সরকার হলে বরাদ্দের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা পশ্চিমবঙ্গের অবশ্য প্রাপ্য।

দ্বিতীয়ত, শুধু বরাদ্দ পাওয়া নিয়ে নয়, বরাদ্দের সদ্ব্যবহার করা নিয়েও রয়েছে অনেক প্রশ্ন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক বরাদ্দকৃত অর্থ রাজ্য সরকারের অবিমৃশ্যকারিতায় বা স্বেচ্ছাকৃত বিরোধিতায় খরচ না হয়ে পড়ে আছে। কলকাতার চারপাশ জুড়ে নতুন মেট্রো স্টেশনসমূহের সম্প্রসারণ যার মধ্যে অন্যতম। এতে ক্ষতি হয় দ্বিবিধ। প্রথমত, বরাদ্দ অর্থ ফেরত যাওয়ায় কাজ সম্পূর্ণ হয় না, পরিকাঠামোর উন্নতি হয় না— জনসাধারণ বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়ত, কাজ পিছিয়ে যাওয়ায় খরচ অনেক বাড়ে, ফলে সামগ্রিকভাবে জনগণের ঘাড়েই করের বোঝা বাড়ে। শুধু মেট্রোরেল খাতেই প্রথম হিসেবকৃত খরচ চার হাজার কোটি থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা আর শেষ পর্যন্ত সেই খরচ দাঁড়াবে ২০ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ ২৮ হাজার কোটি টাকা বাড়তি খরচ। আর এই রেলপথ নির্ভর যে নতুন অর্থনীতি সর্বত্র গড়ে উঠত তার ফলে রাজ্যের মোট বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পেত প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে এবং রাজ্যে যদি কেন্দ্র বিরোধী কোনো দল আবার ক্ষমতায় আসে তাহলে আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যবাসীর মোট ক্ষতি তিন লক্ষ কোটি টাকা। এখন রাজ্যবাসীই ভেবে দেখুন, কেন্দ্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকারী দলকেই রাজ্যে ক্ষমতাসীন করবেন না কেন্দ্রবিরোধী কোনো দলকে ক্ষমতায় এনে অন্ধকারকেই আরও দীর্ঘায়িত করবেন।

—এ. ঘোষ,
বালি, হাওড়া।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

প্রথমেই আপনি আমার প্রণাম নেবেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সভায় আপনি আপনার প্রতিশ্রুতির চেয়েও হাজার গুণ বেশি কাজ করেছেন বলে দাবি করছেন। আপনি আগে দাবি করেছিলেন ৯৯ শতাংশ কাজই হয়ে গেছে। যদিও এখন বলছেন ৮০ শতাংশ কাজ হয়েছে। আমি বলি ২০০ শতাংশ দাবি করুন, কারণ মানুষ এখন আপনার সংখ্যাতত্ত্বে ক্রমশ বিশ্বাস হারাচ্ছে। সিঙ্গুরের জমিহারা মানুষরা আগামী পঞ্চাশ বছরেও জমি ফেরত না পেতে পারেন একথা আপনি বিধানসভাতে ঘোষণা করে দিয়েছেন। সিঙ্গুরের মহাদেব দাস সহ অনেক অনিচ্ছুক আন্দোলনকারী কৃষক আজ তৃণমূলে ব্রাত্য। রাজকুমার দুলে বা তাপসী মালিক আজ শুধু স্মৃতিচারণের জন্য রয়ে গেছে, তাদের হত্যাকারীদের সাজা আর কোনোদিন হবে না।

নন্দীগ্রাম আন্দোলন এই রাজ্যে পরিবর্তনের এক মাইল ফলক। শুভেন্দু অধিকারী ও আপনার নেতৃত্বে এই আন্দোলন ভারতে এক ইতিহাস রচনা করেছিল। কিন্তু তারপর দেখলাম... এই নির্মম হত্যার সঙ্গে যুক্ত অফিসারেরা আজ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, এমনকী কেউ কেউ প্রমোশন পেয়ে আরও উচ্চপদে বহাল হলো এবং সিপিএমের যে-সমস্ত ক্যাডাররা এই হত্যাকাণ্ড এবং ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের কোনো শাস্তি হলো না। নন্দীগ্রামের ধর্ষিতা মা-বোনদের অনেকেই ধর্ষকদের একে একে গ্রামে ফিরে আসতে দেখলো। ধর্ষকরা এভাবে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াবে একজন মহিলার পক্ষে সেটা সহ্য করা কতটা কষ্টকর সেটা আপনি ভেবেও দেখলেন না। ঠিক একই রকমভাবে রিজওয়ানুর কাণ্ডের জন্য দায়ী পুলিশ অফিসাররা আজও মর্যাদাপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত। যে বিডিও কল্লোল শূরের খুনের বিচার আপনি দাবি করেছিলেন বিভিন্ন জনসভায়, আশ্চর্যজনকভাবে আপনার গঠিত কমিশন সেই হত্যাকাণ্ডকে 'আত্মহত্যা' বলে ঘোষণা করেছে। পরিবর্তনের পর এই 'আত্মহত্যার' ঘোষণায় দুঃখে-শোকে কল্লোল শূরের বাবা ও মা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও আপনি খোঁজও করেননি তাঁদের। সিপিএমের ছোট আঙ্গারিয়া কাণ্ডের নায়ক তপন-শুকুর এবং আপনার দাবি মতো কঙ্কাল কাণ্ডের নায়ক সুশান্ত ঘোষদের বিচার আজও হলো না। বিচার হলো না বালির সাহসী তৃণমূলকর্মী তপন দত্ত খুনের। সুটিয়ার প্রতিবাদী কণ্ঠ শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস কাসুন্দিয়া নদী সংস্কার সংক্রান্ত দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় প্রাণ দিলেন, অথচ আপনি নির্বিকার রইলেন। পার্ক স্ট্রিটের ধর্ষণ কাণ্ড কোর্টে প্রমাণিত হয়ে গেল, আপনার ভাষায় যা ছিল সাজানো ঘটনা। কলেজে কলেজে শিক্ষকরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হাতে মার খাচ্ছে আর আপনি বলছেন ছোট্ট ঘটনা। আপনার সেই আদুরে ছোট্টরা নদী থেকে বালি তুলছে, সিন্ডিকেট রাজ গড়ে শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করছে। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আপনার আমলে চূড়ান্তভাবে তালা পড়লো হিন্দুস্তান মোটর কারখানায়। সেই জমিতে শিল্প গড়ার কথা মুখে বলছেন অথচ তৃণমূল বাহিনী সেখানে শুধু আবাসন গড়ছে তাই নয় সংলগ্ন ১৬৬ একর জলাভূমি ভরাট করে উপনগরী গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। পূর্ব ভারতের একমাত্র গাড়ি কারখানাটি আপনার হাত ধরে শ্মশান যাত্রা করল।

—ডি. বসু,
মধ্যমগ্রাম, উত্তর ২৪ পরগনা।

বাঘের পিঠে পাকিস্তান

নরেন্দ্র মোদীর বাড়ানো হাতই এখন ভরসা

সাধন কুমার পাল

২০০৩ থেকে ২০১৬-র মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে ৬০২১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ২০৯৮১ জন সাধারণ মানুষ, ৬৪৪৪ জন নিরাপত্তা রক্ষী এবং ৩২৭৯৩ জন সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত। এক সময় ভারতকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তান সাপ পোষার মতো ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের পালন, পোষণ, সৃজন করেছে। রাষ্ট্রীয় আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিষাক্ত ফণা এখন পাকিস্তানের মাথায় ছোবল মারছে। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কিছু আচরণ বিস্ময় জাগাচ্ছে।

আত্মঘাতী হামলা চালাতে লস্কর-ই-তৈবা ও জৈশ-ই-মহম্মদের ১০ জন জঙ্গির একটি দল সীমান্ত পেরিয়ে গুজরাটে ঢুকে পড়েছে। গত ৫ মার্চ শনিবার নজিরবিহীন ভাবে পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা নাসির খান জাঞ্জুয়া ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে এমন একটি বার্তা পাঠান। ইসলামাবাদের তরফে এই বার্তা পেয়ে নড়েচড়ে বসে দিল্লী। তড়িঘড়ি বার্তা পাঠানো হয় গুজরাট প্রশাসনকে। হাই অ্যালার্ট জারি করা হয় গুজরাট জুড়ে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাঠানো হয় এন এস জি-র ৪টি দল। মহাশিবরাত্রির প্রাক্কালে হামলার আশঙ্কায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয় সোমনাথ মন্দির, অক্ষরধাম মন্দির, সরদার সরোবর, রেল স্টেশন বিমানবন্দর-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়। রাজধানী দিল্লীকেও নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়।

গত ১৫ মার্চ মঙ্গলবার সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে প্রচারিত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদে জানা যায় যে, দশ জন পাকিস্তানী জঙ্গি গুজরাটে ঢুকে পড়েছিল বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল তাদের খোঁজ পাওয়া গেছে এবং যাদের তিনজন ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা বাস্তবে ঘটুক বা না ঘটুক

ফাইল চিত্র।

সংবাদমাধ্যমের দৌলতে এই ধরনের সম্ভাব্য হানার সতর্কবার্তা ও অ্যালার্ট জারির খবর শুনতে আমরা অভ্যস্ত। এবারের সতর্কবার্তাটি ছিল চমকে দেওয়ার মতো। কারণ সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হিসেবে চিহ্নিত যে দেশটির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বুকে রক্ত ঝরাতে অভ্যস্ত সেই পাকিস্তান থেকেই এবার সম্ভাব্য হানার সতর্কবার্তা এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, পাকিস্তান কি অবশেষে বুঝতে পারলো যে ভালো সন্ত্রাসবাদ খারাপ সন্ত্রাসবাদ বলে কিছু হয় না? ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের অস্ত্রে শান দিয়ে ভারতকে ধ্বংস করতে চাইলে নিজেদেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী? নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হচ্ছে পাকিস্তানের এই পরিবর্তিত আচরণের। অনেকেই বলছেন পাকিস্তানকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে। যে পাকিস্তান ২৬/১১-এর মুম্বই হামলার ঘটনায় ভারতের দেওয়া যাবতীয় তথ্য প্রমাণ অস্বীকার করে দোষীদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নেয়নি, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া সেই পাকিস্তান ভারতকে সীমান্ত দিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদী হামলার আগাম সতর্ক বার্তা দিচ্ছে এটা বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার। আমেরিকা থেকে এফ-১৬ বিমান কেনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ভারতের মন জয় করা ও সন্ত্রাস দমনে পাকিস্তান সত্যিই আন্তরিক আন্তর্জাতিক মহলের কাছে এমন একটি ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন অনেকেই।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পাকিস্তানের সরকার পক্ষের এই পরিবর্তিত আচরণের আভাস বেশ কিছুদিন ধরেই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, ভারতের অভিযোগ অনুসারে পাঠানকোট হামলার মূল ষড়যন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে পাকিস্তান বার্তা দিতে চেয়েছে। মনে রাখতে হবে যে ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি ভারতের তরফে বার্তালাপের প্রধান শর্ত ছিল। বিগত ১৬ বছর ধরে স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ালেও পাকিস্তান সম্প্রতি মাসুদ আজাহারকে

নজরবন্দি করে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করার সঙ্কেত দিয়েছে।

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতেও কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষণীয়। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি (২০১৬) সোমবার ভোর সাড়ে ৪ টার দিকে আদিয়ালা জেলে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর সলমান তাসিরের হত্যাকারী মুমতাজ কাদরির ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। ২০১০ সালের ১৪ জানুয়ারি পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর সলমান তসির পাকিস্তানের কুখ্যাত ব্ল্যাসফেমি আইনের সমালোচনা করার জন্য দেহরক্ষী পাকিস্তান এলিট ফোর্সের কমান্ডো মুমতাজ কাদরির গুলিতে নৃশংস ভাবে খুন হয়েছিলেন। গ্রেপ্তার করে জেলে ও আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় পুষ্পবৃষ্টি ও স্লোগানের মাধ্যমে বীরের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এই ঘাতককে। আদালতে প্রথম হাজিরার দিন এই ঘাতকের মাথায় গোলাপের পাপড়ি বর্ষণ করে স্পর্শ ও চুম্বন করার জন্য আইনজীবীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বন্দি অবস্থায় জেলে এই ঘাতককে সহ বন্দিরা এমনকী জেল রক্ষীরাও ধর্মীয় নেতার মতো সম্মান করতো। এই ঘাতকের কাছ থেকে ধর্মীয় পাঠ নেওয়া এক জেলরক্ষী কুখ্যাত ব্ল্যাসফেমি আইনে অভিযুক্ত এক বন্দিকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি পর্যন্ত করেছে। ইসলামাবাদে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই ঘাতকের নামে একটি মসজিদের নামকরণ করা হয়। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে কথা বলার সময় বলে ছিলেন তিনি এই হত্যা কাণ্ডের প্রকাশ্য নিন্দা করতে অপারগ। কারণ পাকিস্তানী সেনার একটি ভালো অংশ এই ঘাতকের প্রতি সহানুভূতিশীল। যে বিচারপতি এই ফাঁসির আদেশ ঘোষণা করেছেন তাকেও নিজের নিরাপত্তার জন্য দেশ ছাড়তে হয়।

পাকিস্তানের ইসলামিক কট্টরপন্থীদের নয়নের মণি এই ঘাতকের ফাঁসির খবর প্রচারের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি ও করাচির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ইসলামাবাদের আইনজীবীরা একদিনের হরতালের ডাক দেয়। সুন্নি তেহরিক দেশভর প্রতিবাদ কর্মসূচি গড়ে তোলার ডাক দেয়। পাকিস্তান জুড়ে নিরাপত্তা আটোসাটো করা হয়। বড় ধরনের বিক্ষোভ ঠেকানোর লক্ষ্যে পুলিশ ইসলামাবাদে ঢোকার প্রধান সড়ক বন্ধ করে দেয়, ছুটি রাখা হয় বেশ কিছু স্কুল, সতর্ক থাকতে বলা হয় সেনাবাহিনীকেও।

সন্দেহ নেই ইসলামিক কট্টরপন্থীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এই ফাঁসি কার্যকর করার বিষয়টি পাকিস্তানের সরকারের মানসিকতার পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। লক্ষণীয় যে পাকিস্তানী মিডিয়া মুমতাজ কাদরির সমর্থকদের প্রতিবাদ বিক্ষোভকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার আগ্রহ দেখায়নি। টেলিভিশন চ্যানেলগুলি দ্রুত এই ফাঁসি ও বিক্ষোভ সংক্রান্ত খবর থেকে সরে গিয়ে ২৮ মার্চ রবিবার 'এ গার্ল ইন দ্য রিভার' ছবির সুবাদে স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র বিভাগে প্রথম পাকিস্তানী মহিলা শারমিন ওবায়েদ চিনয়ের অস্কার পুরস্কারে বিজয়ের সংবাদের মতো খবরের দিকে ঝুঁকে যায়। সন্দেহ নেই এই ঘটনা পাকিস্তানের মিডিয়ার মনস্তত্ত্বেও একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী ঘটনা।

সংখ্যায় কম হলেও বিশ্লেষকদের একটি অংশ মনে করেন পাকিস্তানের মনস্তত্ত্বে কিছু পরিবর্তন না এলে এলিট ফোর্সের কমান্ডো এবং তাসিরের দেহরক্ষী মুমতাজ কাদরির ফাঁসির আদেশ বহাল রাখা ও তা কার্যকর করা সম্ভব হতো না। বিশ্লেষক ও স্তম্ভ লেখক জাহিদ হোসেনের মতে গত ১৮ মাস ধরে পরপর ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার জেরে পাকিস্তানের মূল স্রোতের মানুষের মানসিকতা পাল্টে গিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ, বিশেষ করে ২০১৪ সালে পেশোয়ারের সেনা স্কুলে তালিবানি হামলায় ১৩০ জনেরও বেশি স্কুল ছাত্রের মৃত্যু ও আফগানিস্তান বর্ডার সংলগ্ন উত্তর ওয়াজিরিস্থানে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে চলমান সেনা অভিযান পরিস্থিতির পরিবর্তনে অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে। একটা সময় ছিল যখন জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির কথাই ছিল শেষ কথা। এখন আম জনতা ওদের বিরুদ্ধে মুখ খুলছে এবং বিরোধিতা করার সাহস পাচ্ছে।

পাকিস্তানের পরিবর্তিত আচরণের মধ্যে খারাপ সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে মোদীর নিজস্ব ক্ষমতা ও আগ্রহের অর্থাৎ ডিপ্লোম্যাটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-য়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে বলে অনেকেই মনে করেন। গত বছরের ডিসেম্বরের শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অঘোষিত এবং অপ্রত্যাশিত পাকিস্তান সফর সকলকে চমকে দিয়েছে। আফগানিস্তান থেকে আচমকা লাহোরে গিয়ে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। নওয়াজ নিজের জন্মদিন এবং নাতনির বিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষে শুক্রবার লাহোরে তার পৈতৃক বাড়িতেই ছিলেন। নরেন্দ্র মোদী সেখানে গিয়ে দুই ঘণ্টা আলাপ করেছেন। ১১ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অটলবিহারী বাজপেয়ী লাহোরে এরকম একটি বৈঠক করেছিলেন। পাকিস্তানের শক্তিশালী সেনাবাহিনী দৃশ্যত এই সফরে খুশি না হলেও একাধিক টেলিভিশন জরিপে দেখা গেছে এইরকম জন্মদিনের ও গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নরেন্দ্র মোদীর শান্তি প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগকে ভারত পাকিস্তানের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছে।

জন্মলগ্ন থেকে ভারত বিরোধিতাই পাকিস্তান নামক দেশটির অস্তিত্বের ভিত্তি। ভারতকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তান ইসলামিক সন্ত্রাস নামক বাঘের পিঠে চড়েছে। বাঘের পিঠে চড়া সহজ, নামা নয়। পাকিস্তানের বিস্ফোরক চলমান পরিস্থিতি বলছে ইসলামিক সন্ত্রাস নামক সেই বাঘ এখন স্রষ্টারই ঘাড় মটকাতে চাইছে।

এই পরিস্থিতিতে ভারত অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর বাড়িয়ে দেওয়া হাতই পাকিস্তানের একমাত্র ভরসা। তিনটি যুদ্ধের স্মৃতি, ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে আশ্রয় ও প্রশ্রয়ের নীতি এবং মুম্বই ও পাঠানকোটে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর দুই দেশের মধ্যে যে অবিশ্বাসের কালো মেঘ জমেছে তা কাটিয়ে উঠে চট করে পারস্পরিক আস্থা ফেরানো সহজ না হলেও আস্থাজ্ঞাপক যে কোনও ঘটনা অবশ্যই স্বাগত। ডুবতে থাকা কেউ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে তেমনই পাকিস্তান চিরশত্রু ভারতকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
28 March - 2016 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

দাম : ১০.০০ টাকা